

চাকনা পূজা পার্ব



বাকি য় কৃষ্ণ দেও



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

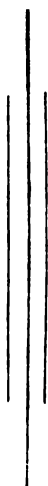
কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhante

চাকমা পূজা পার্বণ



শ্রী বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট
রাংগামাটি ।

প্রথম প্রকাশ : মার্চ / ১৯৮৯ ইং, ফাল্গুন / ১৩৯৫ বাংলা ।

প্রকাশক : **স্বরেন্দ্র লাল দ্বিপূরা**
পরিচালক
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট
রাংগামাটি ।

প্রচ্ছদ : **স্মৃতি জীবন চাকমা**

মুদ্রক : **কালী শংকর দেওয়ান**
সরোজ আর্ট প্রেস
রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি ।

সূচীপত্র :

১। চাকমা পূজা পার্বণ—	১
২। গঙাত ভাতঘরা দেনা—	৮
৩। মালক্ষী মা পূজা—	৯
৪। মুয়া ভাত—	১৩
৫। চামনী—	১৩
৬। চুমুলাং—	১৪
৭। অহুইয়া—	১৬
৮। সিলি—	১৭
৯। ফানাচ বাত্তি—	২০
১০। আহুজার বাত্তি—	২০
১১। ধর্ম কাম—	২১
১২। থানমানা—	২৫
১৩। মালেইয়া—	২৭
১৪। আহুল পালানী—	২৮
১৫। মাধাধুয়া—	২৮
১৬। জুম মারানা—	৩৩
১৭। কুলুক্ মারানা—	৩৭
১৮। ভুত পূজা—	৩৮
১৯। শিজি—	৪১
২০। ভাতগা—	৪৩
২১। এদা দাগা—	৪৮
২২। ব্রাহ্মচক্র—	৫০
২৩। বিষ্ণু—	৫২
২৪। কঠিন চীঘর দান—	৫৬
২৫। বিবাহ	৫৯
২৬। মৃত সৎকার—	৬৪
২৭। গাড়ী টানা—	৭০
২৮। পরিশিষ্ট—	৭৫

চাকমা পূজা পার্বণ

চাকমা সমাজে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তার জন্মে কোন শাঁখ বাজেনা, উলুধনি উঠেনা,—কোন প্রকার মঙ্গলিক অনুষ্ঠানই তার জন্মে অপেক্ষা করে থাকেনা। শুধু যখন নবজাতকের নাভি ঝরে যায় তখন একটা মাত্র অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে জাতকসহ প্রসূতি পরি-শুদ্ধ হয়ে হেঁসেলে ঢোকার অনুমতি পায়। এ অনুষ্ঠানের নাম ‘কজ্জই পানি লনাহু’। চাকমা বিশ্বাসমতে সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির এক ধরনের অশুচিতা জন্মে, সে জন্মেই এই অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষ্যে দু’একজন লোক খাওয়ানো হয়ে থাকে। শিশুর নাম করণেরও কোন আনুষ্ঠানিকতার বলাই নেই। বর্তমান শিক্ষিত সমাজের কথা বাদ দিলে, গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ ঘরে মা, বাপ, খুড়ো, জ্যেষ্ঠা যার যা’ খুশী একটা ডাকতে ডাকতেই শিশুর চক্ষুসই একটা নাম চালাই হয়ে যায়। কারো কারো পোশাকী নামও অবশ্য একটা থাকে। বিশেষতঃ পাঠশালায় যারা যায়, শিক্ষক মহাশয়ের হাতেই তাদের নামকরণ ঘটে। এভাবে একজন চাকমা শিশু জন্মের পর থেকে সরল অনাড়ম্বর পারিবারিকতার মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে। ছেলে হোক আর মেয়েই হোক সমাজে কিন্তু সব শিশুদের সমান কদর।

ভিন্ন সমাজে শিশুর জন্মলগ্ন থেকে অন্নপ্রাসন, নামকরণ ইত্যাদি একটার পর একটা উৎসব লেগে থাকে; সেক্ষেত্রে চাকমা সমাজে অনুরূপ অনুষ্ঠানাদির অনুপস্থিতি স্বভাবতই চাকমা সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা বিসদৃশ ধারণা জন্মে। আরো মজার কথা, চাকমাদের মধ্যে নৃত্যগীত সমন্বিত কোন জাতীয় উৎসবেরই প্রচলন নেই। জাতীয় নৃত্যতো নেই বললেই চলে। গানের মধ্যেও কয়েকটা মাত্র সুরের সন্ধান পাওয়া যায়; যেমন, ‘অলি’

অর্থাৎ ঘুমপাড়ানী গান, উভাগীত, *গেংখুলীদের পালাগানের সুর ইত্যাদি। এসব কিছুই পেছনে কারণ কিন্তু একটাই। ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসার আগ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দীকাল চাকমারা বিরূপ পারিপার্শ্বিকতার টানা পোড়নে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এই সময় দক্ষিণে মগ এবং পূর্ব-দিক থেকে লুসাই উপজাতির ক্রমাগত হামলার মুখে তাদের একরূপ পালিয়ে বেড়াতে হয়। তাই নন্দন সংস্কৃতি বলতে যা' বোঝায়, চাকমাদের মধ্যে তা' গড়ে উঠার সময় এবং সুযোগ কোনটাই ছিলনা। এ সময়ে রচিত একটা ছড়ার মধ্যে তৎকালীন চাকমাদের দুর্ববস্থার একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যায়,—

‘ঘরত্ গেলে মঘে পায়,
 কারত্ গেলে বাঘে খায়।
 মঘে ন পেলো বাঘে পায়,
 বাঘে ন পেলো মঘে পায়।’

[ঘরে গেলে মঘে পায়, বাড়ে অর্থাৎ জঙ্গলে গেলে বাঘে খায়।
 মঘে না পায় তো বাঘে পায়, বাঘে না পায় তো মঘে পায়।]

আর লুসাইদের উপদ্রব তো বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার মত ‘কুগী ডর’ অর্থাৎ কুকীর ভয় নামে আজো কিংবদন্তী হয়ে আছে। এমনকি ব্রিটিশ আসার পরও এদের হামলার কোন কমতি ছিলনা। কথিত আছে, লুসাইরা একরাজে বাইশ মৌজার উপর হামলা চালায়, যার ফলে বর্তমান নানিয়ারচর উপজেলাধীন বড়াদম সাকিনের নীলচন্দ্র দেওয়ান নামক জনৈক পুলিশ অফিসারের পিতাসহ অসংখ্য চাকমা নিহত হয়। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তখন ব্যাপক অভিযান চালিয়ে এদের দমন করেন।

চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, সে কারণে চাকমাদের অধিকাংশ আচার অনুষ্ঠান পুরোপুরি বৌদ্ধধর্মভিত্তিক। এমনকি মৃত সৎকার এবং শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানেও ধর্মীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে এমন কিছু আচার অনুষ্ঠানও বেশ কয়েকটা দেখা যায়, যেগুলি বৌদ্ধ আদর্শের পরিপন্থী। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এককালে ধর্মের অবনতির যুগে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুদের তান্ত্রিক মতবাদের সাথে মিশে তন্ত্রযান, মন্ত্রযান, বজ্রযান ইত্যাদি নানা বিকৃত ধর্মের রূপ নেয়, আর সেই সঙ্গে হিন্দুদের বহু দেবদেবী ও হিন্দু আচার অনুষ্ঠান এই ধর্মে অন্তর্গত করে। চাকমা ভাষার গাঙ, গঙা, গঙ্গি ইত্যাদি শব্দ নদী অর্থে ব্রূয়। আর চাকমাদের জলদেবীর নামও গঙা। এই সব শব্দ মিসেন্দেহে গঙ্গানদী এবং হিন্দুদের গঙ্গাদেবীকেই নির্দেশ করে। হিন্দু ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত যে সব পূজা-পার্বণ চাকমা সমাজে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়, তার প্রায় সবগুলোতেই গঙা বা গঙ্গাদেবীর স্থান সর্বোচ্চ। এসব পূজার পশুপাখী বলি দেওয়ার বিধান আছে। এতে মনে হয়, চাকমারা এককালে বোধ হয় গঙ্গার তীরবর্তী বা গঙ্গার কাছাকাছি কোন স্থানে বসবাস করত। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্ত কোন উপজাতির মধ্যে কিন্তু নদীকে গাঙ, গঙা অথবা গঙ্গি বলা হয় না। এবিষয়ে চাকমাদের মধ্যে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, চাকমারা ক্ষত্রিয় এবং নেপালের শাক্যবংশেরই একটা দলছুট গোষ্ঠী। রাজা বিড়ুটকের শাক্য নিধনের সময় কিংবা পরবর্তীতে বৌদ্ধ বিতাড়ন কালে নেপাল ছেড়ে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে ক্রমে ক্রমে আসাম হয়ে এখানে এসে পড়েছে। কথাটির বোধহয় অনেকাংশে সত্য নিহিত রয়েছে। এখানে অশ্রাসঙ্গিক হলেও একটা ব্যাপার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম সার্ক সম্মেলন চলাকালে বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে একটা নেপালী ডকুমেন্টারী ফিল্ম সম্প্রচার করা হয়েছিল। কাহিনীর মুখ্য বিষয় বস্তু ছিল নেপালী জাতীয় বিচার পদ্ধতি। ছবিতে অপরাধীকে যেই যেই সামাজিক দণ্ড দেওয়া হয়েছিল বলে দেখানো হয়েছে যেমন,—দোষী ব্যক্তির মাথার চুল তিন ফালি করে কেটে দেওয়া, গুয়েরের খাঁচা কাঁধে নিয়ে টেঁড়া

পিটিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে নিজের নিজের অপরাধের কাহিনী বলতে বাধ্য করা,—ইত্যাদি সবই চাকমা জাতীয় বিচারে প্রযোজ্য দণ্ডের মতই হব্ব এক। তফাতের মধ্যে শুধু চাকমা অপরাধীকে এখন এখানে মুরগীর খাঁচা গলায় ঝুলানো বিধি। তবে সামাজিক খানার জন্তু শুয়োর দণ্ড দেওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য।

চাকমা সমাজে যে সব পূজা অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই মানসিক পূজা। যেমন অহুইয়া, আহুজার, বাস্তি, চামনী, চুমুলাং, ধর্মকাম, সিন্দি ইত্যাদি। বিপদে পড়লে প্রায় সবধর্মের লোকই বিপদ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্তে হরহামেশা কিছু না কিছু মানত করে থাকে। বিপদ কেটে গেলে তারপর একসময় মানত শোধ করে। অনেকে পান তামাকও মানত করে এবং বিপদ কাটা না যাওয়া পর্যন্ত এসব জিনিষ স্পর্শ করেনা। এটা একরকমের ব্রতপালন। বৌদ্ধধর্মে এটাকে ‘শীলব্রত পরামর্শ’ বলে। এখানে চাকমাদের পাশাপাশি বহুদিন ধরে যদিও আরো বহু বিভিন্ন উপজাতির বসবাস চলছে, তাদের পূজা পার্বণের সাথে কিন্তু চাকমাদের আচার অনুষ্ঠানাদির খুব কমই মিল দেখা যায়। মালক্ষী মা পূজা এবং থানুমানা এই দু’টি মাত্র অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের সাথে কিছুটা মিল থাকলেও পূজা পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সার্বজনীন বিষ্ণু উৎসব রূপেই পালিত হয়ে থাকে।

জাতির দুর্দিনে ধর্মেরও অবনতি ঘটে, এটা স্বাভাবিক। এমনই অন্ধকার যুগেরই সাক্ষ্য বহন করে চাকমা সমাজের পুরোনো দিনের বৌদ্ধ পুরোহিতেরা, যাদের বলা হয় ‘করি’ বা ‘নুরি’। এই শব্দটা বোধ হয় মধ্যযুগের রাউল বা রাউলী শব্দ থেকে এসেছে। বয়োবৃদ্ধেরা এদের আহ্বান করে থাকেন ‘থর’ বলে, যেটা খুব সম্ভব পালি ‘থের’ অর্থাৎ হ্রিবির শব্দের অপভ্রংশ। এরা মাথা মুড়োয়, পীত বসন পরে কাছা দিয়ে। কথিত আছে, সেই বৌদ্ধ বিতাড়নের যুগে প্রাণভয়ে পলায়নের সময় বৌদ্ধভিক্ষুরা

দ্রুত গমনের সুবিধার্থে কাছা দিতে বাধ্য হয় ; আর তখন থেকেই এদের মধ্যে কাছা দিয়ে চীবর পরিধান করা চালু হয়ে যায়। ব্রহ্মার্চ্য এদের জন্ত অপরিহার্য নয়। এরা বিয়ে করে সংসারী হতে পারে। অনেকে শুধু প্রয়োজনের সময় কাছায় ধারণ করে গৃহস্থ বাড়ী গিয়ে পূজাপাঠ সমাধা করে দিয়ে আসে। এদের ব্যবহার্য একমাত্র প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ‘আঘরতারা’ চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালায় লিখিত। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সেই দূর অতীতে চম্পক নগরের যুবরাজ বিজয়গিরি যখন রাজ্য জয়ে বের হয়েছিলেন তখনও চাকমাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল এবং শিক্ষাদীকার প্রতি তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। অভিযান যখন শেষ অর্থাৎ আরাকানের সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত যখন চাকমাদের জয় করা হয়ে গেছে সেই সময়কার গৃহ প্রত্যাগমনোন্মুখ সৈন্যদের গানে আছে,—

“পোর্বরা পন্দিত্ নেই যে দেজত্,
থেদং নয় ভেইলক্ সে দেজত।
যেই যেই ভেইলক্ ফিরি যেই,
সাপ্রেই কুলত্ ফিরি যেই।”

(পড়ুয়া পণ্ডিত নেই যে দেশে, থাকবোনা ভাইসব সে দেশে। চল চল ভাইসব ফিরে যাই, সাপ্রেই কুলে ফিরে যাই।) বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, শিক্ষার প্রতি এত অনুরাগ এত আকুলতা খুব কম জাতিতেই দেখা যায়।

আঘরতারা বৌদ্ধ সূত্র পিটকের অন্তর্গত কয়েকটা সূত্রের সমষ্টি মাত্র। ভাষা বিকৃত পালি এক ছর্বোধ্য। চাকমাদের প্রচলিত কিংবদন্তী মতে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। বেশত্যাগ কালেই আঘরতারা সঙ্গে আনা হয়েছিল এবং সুদীর্ঘ কাল ধরে এর পুনঃ পুনঃ অনুলিখন এর বিকৃতি ঘটায় কারণ। অমেকে মনে করেন, চাকমারা ব্রহ্মদেশ, আরাকান ইত্যাদি জায়গায় এসেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ; কিন্তু সেক্ষেত্রে চাকমা ভাষার সঙ্গে সেসব দেশীয়

ভাষার কিছু না কিছু ঘটা ছিল অনিবার্য। আশ্চর্যের বিষয় যে, চাকমা ভাষায় ক্যং, স্তং, চাঙি, সাবেক এবং ওয়া এই কয়েকটি স্বরী শব্দ ছাড়া একটিও বার্মিজ শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং ভাষার আদান প্রদান যেখানে অনুপস্থিত সেখানে ধর্মের আদান প্রদান কী করে সম্ভব? ধর্মের পুনরুজ্জীবনের সাথে সাথে আঘরতারা এখন অপ্রচলিত এবং অবহেলিত হয়ে আছে। রুগি কিন্তু সমাজের আনাচে কানাচে এখনও ছুঁ একজন দেখা যায়। তখনকার দিনে মৃত সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি কাজ এবং বৌদ্ধধর্মভিত্তিক পূজা পার্বণ এদের পৌরহিত্যেই সম্পন্ন হত। এখন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের স্থান দখল করে নিয়েছেন।

বিশ্বেশাদী থেকে আর আর যাবতীয় সামাজিক জিন্সাকালে পৌরহিত্য করার জন্তে পূর্বোক্ত রুগিদের মত চাকমা সমাজে আরেক শ্রেণীর লোক রয়েছে। এদের বলা হয় ‘অঝা’। অঝা আসলে বাংলা ওঝাই। তবে চাকমা সমাজে অঝা বলতে ধাইকেও বুঝায়, যে প্রসূতির গর্ভ খালাস করে থাকে। অঝারা তুচ্ছতাক্ মস্ত্র জ্ঞানে, পাহাড়ী চিকিৎসা বিদ্যায়ও তাদের কম বেশী দক্ষতা থাকে। অনেক রোগে এদের বনজ ঔষধ প্রায় অব্যর্থ। অনেক অঝা আবার ভালো সর্পবিদ্যা বিশারদ। এসব কারণে চাকমা ভাষায় অঝা আর বৈজ্ঞ শব্দ দু’টি প্রায় সমার্থবোধক। চাকমা ধাই অর্থাৎ স্ত্রী অঝারাও বড় কম যায় না। তাদেরও শিশুরোগ, স্ত্রীরোগ প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকে। গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থান বুঝতে পারে। প্রসবের পক্ষে তেমন বিগঞ্জনক মনে হলে হাতের কৌশলে গর্ভস্থ ক্রণের সঠিকভাবে সংস্থাপন করে সুপ্রসব করাতে জানে। এসব কারণে চাকমাদের মধ্যে প্রসবকালীন শিশুমৃত্যুর হার তুলনামূলক ভাবে কম। প্রতি পাড়াতে অভিজ্ঞ অঝা ছুঁ একজন থাকে। বহু অভিজ্ঞতা যাদের থাকে ‘রাজ অঝা’ বলে তাদের নাম রটে যায়।

পুরুষ অঝাদের কিন্তু এখন খুব আকাল। সমাজে শিক্ষা সম্প্রসারণের

সাথে সাথে পুরোনো দিনের পূজাপাঠ এখন অনেক কমে গেছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণেও এ সমস্ত পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা এখন আর বিশেষ সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাই সমাজে অঝাদের সংখ্যাও খুব কমে গেছে। চাকমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে অঝাদের পৌরোহিত্য অপরিহার্য, সে কারণে এখনও এরা টিম্ টিম্ করে টিকে রয়েছে।

পূজা পার্বণে পশুপাখী বলি দেওয়ারও একটা নির্দিষ্ট বিধি বিধান আছে। যে সমস্ত পূজার বলির বিধান থাকে সেক্ষেত্রে বলি দেওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেবতা ভোগ নিতে রাজী আছেন কিনা ‘আগ্ পাতা’ ফেলে আগে ভাগে তা’ যাচাই করা হয়ে থাকে। ছটো কাঁঠাল পাতার ঐশে মাঝামাঝি কেটে ল্যাজার অংশ ছ’টো তর্জনী, মধ্যমা আর অনামিকার কাঁকে রেখে দেবতার উদ্দেশ্যে তাঁর মতামত প্রার্থনা করে পূজাবেদীর উপর ছুঁড়ে দেওয়া হয়। পাতা ছ’টোর যদি একটার সামনের দিক আর অপরটার পিঠের দিক উপরমুখী করে পড়ে, তবে বুঝা যাবে দেবতা ভোগ নিতে রাজী আছেন। ছ’টি পাতাই যদি পিঠের দিক উপরমুখী হয়ে পড়ে, তবে বুঝতে হবে দেবতা নারাজ। আর যদি ছ’টোরই সামনের দিক উপরমুখী হয়ে পড়েছে দেখা যায়, তবে ধরে নিতে হবে দেবতা চালাকী খেলছেন কিংবা ঠাট্টা জুড়ে দিয়েছেন। এই উভয় অবস্থাকে দেবতা যতক্ষণ না রাজী হচ্ছেন বার বার আগ্ পাতা ফেলা চলতে থাকে। বলি দেওয়ার সময় শূকর কিংবা হাঁস মুরগী ইত্যাদির শির ছিন্ন না করে শুধু কণ্ঠনালী ছিন্ন করে বধ করলে চলে। কিন্তু পাঁঠা, মোষ ইত্যাদি পশুর বেলায় এক কোপে মূণ্ডটা বিচ্ছিন্ন করাই বিধি। ব্যতিক্রম ঘটলে ঘোরতর অমঙ্গল আশঙ্কা করা হয়ে থাকে। তখন একটর স্থলে ফের জোড়াবলি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান আছে।

পরিশেষে একটা কথা এই যে, পূজা পার্বণ একটা সমাজের জন্ত শুধু কিছুটা আমোদ প্রমোদ বা কিছু পূজা অর্চনা এরূপ অর্থ বহন করেনা।

যে সমাজে যেই যেই আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকে, সেগুলি সেই সমাজের তথা সেই জাতির কুল প্রথা বা কুলচার। এসবের ভিত্তিমূলে ধর্মীয় প্রভাব বা অন্যবিধ ভাবাদর্শ যাই থাকনা কেন, এগুলির যথাযথভাবে আচরণের মধ্য দিয়ে জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষিত হয় এবং সর্বোপরি সমাজ জীবনে অখণ্ডতা ও সংঘবদ্ধতা বজায় থাকে। সংবদ্ধ ভাবে কুলধর্ম আচরণ করা স্বয়ং বুদ্ধ কর্তৃক প্রশংসিত। লিচ্ছবীদের সপ্ত অপরিহার্য ধর্মের এটি একটি অন্যতম ধর্ম। এখানে সর্বমোট পঁচিশ প্রকার চাকমা পূজা পার্বণের কথা তুলে ধরা হয়েছে; তবে এর কিছু কিছু তথ্য ইতিপূর্বে স্থানীয় সাপ্তাহিক বনভূমি পত্রিকায় ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ ইংরেজী তারিখ থেকে ২৬শে মার্চ ১৯৭৯ ইংরেজী পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ভরজারি হলে চাকমা জননী সন্তানের যোগমুক্তির জন্য গঙা অর্থাৎ নদী বা ছড়ার জলে একমুঠি ভাত ছিটিয়ে দিয়ে আসেন। এই উদ্দেশ্যে একমুঠো ভাত এক টুকরো কলাপাতায় দিয়ে তাতে বাড়ীর চারকোণা আর মাঝের খুঁটি থেকে দা'ও দিয়ে কিছু চিলতে তুলে মেশানো হয়ে থাকে। তারপর রুগছেলের মাথার উপর তা' ধরে ছেলের মা এই বলে প্রার্থনা করেন যে, আজ অমুকের অমুখ ভালো হওয়ার জন্যে ভাতজরা (মুঠিভাত) দিচ্ছি,—হে মা গঙা!*

ছেলেকে ভালো করে দাও। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'নিখিলনাহ'। এরপর সেই মিশ্রিত ভাতগুলো ঘাটে নিয়ে পানিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

কারো যদি চোখ টাটায়, চোখ থেকে পিচুটি গলে, কারো গায়ে দাদ, খোসপাঁচড়া ইত্যাদি চর্মরোগ দেখা দেয়, তবে তারও প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে অনেকে গঙায় ভাতজরা দিয়ে থাকে। এ সময় ভাতের সঙ্গে আর কিছু মেশানো হয় না।

* এখানে গঙা জলদেবী অর্থে

হয়ে পরস্পর মিলন ইচ্ছায় একসাথে গভীর ভাতজরা দিয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রেমিক যুগলের মুখে উভাগীত জুড়ে দেওয়া হয়েছে,—

“দিলে ভাতজরা গঙা-রে,
মলেহু মরিবং সমারে।”

(গঙাকে ভাতজরা দিলাম। প্রার্থনা করি, আমরা মরি তো যেন একসাথে মরি। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত কেউ যেন আমাদের পৃথক করতে না পারে।)

আগেকার দিনে নির্ভাবতী চাকমা গৃহিনীরা সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতি-বার বাড়ীতে একটি সিদ্ধ ডিম আর সাধারণ ভাত তরকারী দিয়ে মালস্মী মার পূজা দিত। বিশেষতঃ কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে কোন বৃদ্ধী তার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে, তাহলেতো কথাই নেই। পরদিন মালস্মী মার পূজা অবশ্য কর্তব্য। বলাবাহুল্য, মালস্মী মা হলেন হিন্দুদের লক্ষ্মীদেবী। ধান ‘ফাও’ করার সময় এবং নবান্ন উৎসব কালেও মালস্মী মার পূজা অবশ্য করণীয়। মালস্মী মার প্রিয় ভোগ হল ভাড়াই পাখী। অভাবে শূকর, মোরগ এমনকি কাকড়াও হলেও চলে। তা’ছাড়া মদতো আছেই। মজার কথা, হিন্দুদের নিয়ামিখাশী লক্ষ্মীদেবী চাকমাদের হাতে পড়ে মদ মাংস সবই ধরেছেন। সকালবেলা সকলের আহ্বারের আগে মালস্মী মার ভোগ দিতে হয়। এর জন্য কোন অধার দরকার পড়েনা। বাড়ীর গৃহিনীই স্নানান্তে শুদ্ধ শুচি হয়ে মাথায় ‘খবং’* জড়িয়ে পূজার চারধারে কিছু চাল আর জল ছিটিয়ে দেবীকে আবাহন করে ভোগ নিবেদন করে থাকে। আগেকার দিনে যখন বাজ প্যাঁটারার যুগ আসেনি তখন প্রত্যেক চাকমা গৃহস্থের ঘরে ছ’একটা

* ধান কাটা বউনী।

* পাগড়ির মত মাথায় জড়ানোর জন্য এক প্রকার খাটো বহরের নাতিদীর্ঘ কাপড়।

‘ফুল বারেন্’* থাকত। তারি একথানা ডালয় কলা পাতার আগার অংশটা দিয়ে মালক্ষ্মী মার ভোগ সাজানো হত। সাধারণ ভাত তরকারীর সাথে তাতে কমপক্ষে একটি সিদ্ধ ডিম আর মুগগী জবাই হলে তার মাথা, ঘিলা কলিঙ্গা ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে। পূজা শেষে গৃহিনী আবার আগের প্রক্রিয়ায় চাল আর জল ছিটিয়ে দেবী বন্দনা করে পূজার উপকরণগুলো তুলে নিয়ে আসে। এগুলো বিশেষ করে বাড়ীর আত্মরে হেলের ভাগেই পড়ে। মালক্ষ্মী মার পূজায় পশুপাখী বলি দেওয়া হলে তখন কিন্তু অঝার পোরোহিত্য দরকার হয়ে থাকে।

চাকমা লোকায়ত সাহিত্যে লক্ষ্মীপালা নামে একটি পালাগান আছে। চাকমা সমাজে মালক্ষ্মী মার পূজা কি করে স্থান পেয়েছে তার একটা হৃদিস এখানে পাওয়া যায়। প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস মতে সৃষ্টিকর্তাকে চাকমারা ‘গোজেন’ (গোসাই?) বলে থাকে। সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে গোজেন্ মানুষ পয়দা করেন, একজন ছজন নয়, বহুজন। তাদের মুখে তখনও যখন বোল ফুটেনি তখন,—

“কলহ্ গোজেন মানেই মাত,
মানেই মাদিলাক্ গোজেন্ ভাত।

(গোজেন বললেন, ‘মানুষেরা কথা কও’। মানুষেরা বলল,—
“হে গোজেন! আমাদের ভাত দাও অর্থাৎ আমরা ক্ষুধার্ত।) কিন্তু পৃথিবীতে তখন কোথায় ভাত? তখন,—

“ভাদজ মালিক মালক্ষ্মী,
স্বর্গত এলঅ তার বসন্তি।”

* একপ্রকার ঝাঁপি বিশেষ, উচ্চতার ৩/৪ ফুট, নীচের দিকে চারকোণার চারটি অমুক বেতের পায়া থাকে। উপরের ডালাটা মন্দিরের চূড়ার আকারে নির্মিত।

ভাতের মালিক মা লক্ষ্মীর বসতি তখন স্বর্গে। এখন মানব কুলকে খাওয়াতে হলে লক্ষ্মীকে তবে আনতে হয় স্বর্গ থেকে ; কিন্তু কে যাবে ? প্রথমে গেল * কালাইয়া। সে কিন্তু লক্ষ্মীর আবাসে গিয়ে লক্ষ্মীর আভি-
ষেকভায় পড়ে বেশী মদ ভাং খেয়ে আবোল তাবোল বকতে শুরু করে দিল,—

“দিবা আহরেইরে মদ ভাং খেই,
থাক্কে দাগে মা থাক্কে বেই।
রাগে তাগে লক্ষ্মী কর,—
পাগলঅ সমারে যেহুং নয়।”

(কালাইয়া মদ ভাং খেয়ে দিশাহারা হয়ে লক্ষ্মীকে কখনও ডাকে
মা আর কখনও ডাকে দিদি। লক্ষ্মী রাগে বললেন,—‘এ পাগলের সঙ্গে
গাৰো না।)

এদিকে কালাইয়ার ফিরতে দেবী দেখে মনুষ্যকুলে হাহাকার পড়ে
গেল। স্বর্গপুরে এখন কে যাবে খবর নিতে ? লোকের হৃদশা দেখে
বিয়াত্রা** তখন বলল,—

“গঙা পূজি আগে ভুগ্,
দিবানি মরেহু মানৈলুর্কু
যানি তুমি খাম খেলে,
লক্ষ্মী খজা মুই যেম সালে।”

(হে লোক সকল, তোমরা যদি সত্য কর যে গঙাদেবীর পূজার
আমাকেই আগে ভোগ নিবেদন করবে তাহলে আমি লক্ষ্মী আনতে যাব)
সকলে তাতে রাজী হয়ে গেলে বিয়াত্রা তখন স্বর্গে গিয়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে

* চুম্বাং পূজার অগ্রতম দেবতা, পরমেশ্বরী দেবীর প্রথম স্বামী।

** গঙা দেবীর স্বামী।

আসে। সে আরেক দীর্ঘ কাহিনী। লক্ষ্মী এলে তখন পৃথিবীতে লোকের
অশান্তি ঘুচলো। তবে লক্ষ্মীতো আর চিরকাল স্বর্গ ছেড়ে থাকতে পারেন না,
তাই ফিরে যাবার আগে তিনি বলে দিয়ে গেলেন কি ভাবে তাঁকে পূজা
করলে দিন দিন লোকের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। —

“এগামনে গরি সার
পত্তি সাপ্তা রসুত্‌বার,
ধানে চোলে সাজেবাক্,
বাউ মারি ভাত দিবাক্।
আগ্‌ পাদালৈ আগ্‌ চেলে,
মানি বাউ ন পেলেক্,
কুগাহ্‌ গুগর্‌ আর মদ,
ভক্তিয়ে মরেক্‌ দিবা ভাত।
ইয়ানিয়্য য়ে ন প়েবঅ,
কাঙারালৈ তে পুজিবঅ।
পুজ়ে য়ে জ়নে মন ভক্তি,
তা ঘরত্‌ অহ্‌ব ম বসত্তি।
ধনে সোম্বোদে মন পুরা।
ভাদে কাবরে সব পুরা।
কলহ্‌ একখা মালক্ষী,
দিন দিন উধিব তা গিরিত্তি।”

(সপ্তাহে ঐতি বৃহস্পতিবার ধান চাল দিয়ে পূজা সাজিয়ে ভাতুই
মেরে একাগ্রমনে আমাদের ভোগ দেবে। ভাতুই যদি পাওয়া না যায়,
মোরগ অথবা শূকরের মাংস আর মদ দিয়ে আমার ভোগ নিবেদন করবে।
এসবও যে যোগাড় করতে পারবেনা শুধু কাঁকড়া দিয়ে সে আমার পূজা
দেবে। ভক্তিয়ুক্ত মনে যে আমার পূজা করে, আমার বসতি হবে তারই
ঘরে। মনোমত ধন সম্পদ, অন্ন-বস্ত্র কিছুই তার অপূর্ণ থাকবে না।
ম'লক্ষী বললেন, দিন দিন তার সংসারে শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

নুয়া ভাত

নুয়া ভাত বাংলায় নবান্ন উৎসব। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায় নবান্ন অনুষ্ঠান বুদ্ধের জন্মের বছর পূর্ব কাল থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ কৃষিজীবী মাঝেরই জীবনে এ'টি বার্ষিক উৎসব। একজন চাকমা জুমিয়া বা কৃষিজীবী নবান্ন উৎসবের পূর্বে নতুন ফসলের অন্ন মুখে দেয়না। নবান্ন উৎসবের সময় মালিন্দী মার পূজা করা হয় এবং সামর্থ্য মতে পাড়ার পাঁচজনকে খাওয়ানো হয়ে থাকে। সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরে এ উপলক্ষে মালিন্দী মার পূজায় শূকর উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। কারো জুমে কিংবা ধানক্ষেতে যদি “মেমে ছাগলী” পাখী বাসা বাঁধে তবে শূকর বলি দিয়ে ঘটা করে মালিন্দী মার পূজা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এই পূজার সময় ‘মেমে ছাগলীর’ বাসা থেকে গৃহস্থ বাড়ী পর্যন্ত পথের দু'ধারে সাতগাছি করে নুতা টেমে সংযোগ সাধন করতে হয়, যার ভাবার্থ হলো মালিন্দীকে গটা করে গৃহে বরণ করে তোলা। এটা অনেকটা রাস্তার দু'ধারে অভ্যর্থনা জানানোর মত। ‘মেমে ছাগলী’ একটি অতি ক্ষুদ্র পাখী। এরা ধান গাছেও বাসা বাঁধতে পারে। হিন্দুদের যেমন লক্ষ্মী প্যাঁচা এই পাখীটাকেও তেমনি চাকমারা ‘লক্ষ্মীর আশ্রিতা’ বলেই গণ্য করে থাকে।

চামনী

মরণাপন্ন ছেলের আরোগ্য কামনায় অনেক সময় চাকমা জনক জননী ছেলের জন্ত চামনী মানত করে থাকেন। চামনী পালি সামঞ্জ্ এয়া বা শ্রামণ্যত্রত। ছেলে ভাল হয়ে গেলে একদিন ঘটা করে তাকে বিহারে নিয়ে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত করা হয়ে থাকে। এভাবে সে রংবস্ত্র নিয়ে অন্ততঃ সপ্তাহকাল বিহারে অবস্থান করে এবং বিহারবাসী ভিক্ষুর নিকট শ্রামণ্য

ধর্মের পাঠ নিয়ে ব্রত পালন করে। এসময় ভিক্ষায়ে জীবিকা নির্বাহ করাই নিয়ম। ব্রত পূরণের জন্য অন্ততঃপক্ষে একদিন দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয়। বৌদ্ধধর্মে এরূপ ব্রতধারী শিক্ষার্থীকে বলা হয় শ্রামণের। সপ্তাহান্তে সে আবার চীবর পরিত্যাগ করে মা বাবার সঙ্গে গৃহে ফিরে আসে। তখন এ উপলক্ষে ভিক্ষু ভোজনসহ লোকজন খাওয়ানো হয়ে থাকে।

অনেক সময় অনেক বয়স্ক ব্যক্তিও বিপদে পড়ে চামনী মানত করে। তারপর বিপদ কেটে গেলে এক সময় বিহারে গিয়ে মানত শোধ করে দিয়ে আসে। পুরোপুরি ভিক্ষুজীবন গ্রহণের জন্য যারা দীক্ষা নেয় তারা বিহারেই থেকে যায় এবং শিক্ষা সমাপনান্তে উপসম্পদা লাভ করে। চাকমা সমাজে জীবনে অন্ততঃ একবার, বিশেষতঃ বিবাহের পূর্বে বিহারে গিয়ে কিছুদিনের জন্যে শ্রামণ্য ব্রত পালন করা প্রত্যেক পুরুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এর দ্বারা বিশেষ কোন হেরকের হয়না। শীল পালন এবং ব্রহ্মচর্যা আচরণের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের নীতিশিক্ষা গ্রহণই এই প্রথার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সাময়িক ব্রত পালনের জন্যও অন্ততঃ পক্ষে সপ্তাহকাল বিহারে অবস্থান করা আবশ্যিক।

চুমুলাং

যখনই কোন চাকমা বিপদে পড়ে তখন বিপদ মুক্তির জন্য ‘চুমুলাং’ মানত করে। হুর্যোগ কেটে গেলে তখন সে ঘটা করে চুমুলাং পূজা করে। চুমুলাং আসলে বিয়ের পূজা। এই পূজায় একজন দেবী আর দুজন দেবতার পূজা করতে হয়। দেবীর নাম পরমেশ্বরী আর দেবতাদের একজনের নাম কালাইয়া। অপর দেবতার নাম শান্ত্রে বলা হয়নি, তাই একে শুধু ‘নেইনাদ্যা’ অর্থাৎ অনামী বলা হয়ে থাকে। এই দেবদেবীগণ আবার

সর্বসিদ্ধি দাতারূপেও বিবেচিত হন। আগেকার দিনে তাই প্রায় গৃহস্থই সম্বৎসরে একবার গৃহ দেবতার পূজার মত চুমুলাং পূজা করত। এজন্য এই পূজাকে অনেকে ‘ষর’তান্তা’ বলে থাকে। এটা অনেকটা বিবাহ বার্ষিকী উদযাপনের মত যদিও ঠিক বিয়ের দিনে এটা করা হয়না।

চুমুলাং পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ কাহিনী আছে। স্মরণাতীত কালে চাকমাদের মধ্যে বোধ হয় বিয়ের সময় চুমুলাং পূজা করা কিংবা লোকজন খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিলনা। উপরোক্ত দেবতা কালাইয়া। এই প্রথার প্রবর্তক যিনি পরমেশ্বরী দেবীর প্রথম স্বামী। কথিত আছে পরমেশ্বরী দেবীকে বিয়ের পর কালাইয়া বানিজ্যোদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেন। এজন্য কালাইয়াকে সওদাগরও বলা হয়ে থাকে। কথা থাকে যে, বার বৎসরের মধ্যে যদি কালাইয়া ফিরে না আসেন তবে পরমেশ্বরী দেবী এর পরে স্বেচ্ছায় দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবেন। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সেই দূর অতীতে চাকমারা বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য করত। কালাইয়া অবশ্য দৈবগতিক ঠিক সময়ে ফিরতে পারেন নি আর পরমেশ্বরী দেবীও বার বছর গতে আর একজনকে বিয়ে করে ফেলেন। এর পর কালাইয়া ফিরে এসে দেখতে পান যে, স্ত্রী বেহাত হয়ে গেছে। তখন তিনি চুমুলাং পূজা করে লোকজন খাইয়ে এবং সম্ভবতঃ তাদের মর্ত্যমত নিয়েই স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন সেই থেকে বিয়ের সময় চুমুলাং পূজা করা আর লোকজন খাওয়ানো চাকমা সমাজে চলতি হয়ে গেল। কালে কালে উপরোক্ত তিনজনও এই পূজার দেব দেবীর আসনে কায়ম হয়ে গেলেন। এখন আর চুমুলাং না করলে বিয়ে সিদ্ধ হয়না। আর, যেন তেন প্রকারের একটা বিয়ের খানা দিতে হবেই। অকথ্যই সেই লোকের মৃত্যু হলে তার মড়া কাঁধে না তুলে হাঁটুর নীচে ঝুলিয়ে অসম্মান জনকভাবে শ্মশানে নেওয়াই বিধি।

চুমুলাং পূজায় মদ, তিনটি মুরগী, বাচ্চা হলেও ক্ষতি নেই, অধিকন্তু

একটি শূকর লাগে। অভাব পক্ষে শুধু তিনটি মুরগীর বাচ্চা হলেও চলে। অবা বা পুরোহিত ঘরের মধ্যে চাটাইয়ের উপর কিছু ধান, চাল, কার্পাস ইত্যাদি দিয়ে পাশাপাশি ছুঁটো পূজা সাজায়। সামনে এক একটি সরষে তেলের পিঁসি জ্বলে। তারপর পূজার শূকর এবং মুরগীগুলো বলি দিয়ে অবা সেগুলোর মাথা এবং রক্ত মত পানীর সহযোগে পূজায় নিবেদন করে। অব্যার পূজাপাঠ শেষ হলে স্বামী স্ত্রী জোড়ায় এসে পূজা প্রণাম করে। এই পূজায় সিদ্ধ অবস্থায় দ্বিতীয়বার ভোগ নিবেদন করতে হয়। এই শেষবার ভোগ দেওয়ার পর অবা আর পাড়ার বুড়োরা মিলে পূজার ফলাফল নিয়ে আলোচনায় বসে। এই সময় ভোগের জন্ত নিবেদিত সিদ্ধ ডিম মুরগীর ঠ্যাং, মাথা ইত্যাদি নিয়ে অবা দম্পতির ভবিষ্যত শুভাশুভ বিচারে প্রবৃত্ত হয়। এই পূজা মানসিক করা পূজা হলে তা' দেবতার সন্তুষ্টি বিধান করে ভালভাবে উত্তরে গেল কিনা তাও নিরূপণ করা হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'চান্দা চানাহ'।

অহুইয়া

অপুত্রক ব্যক্তি কামনার অথবা অনেকগুলো পুত্র সন্তানের পর একটি মেয়ে সন্তান পাওয়ার বাসনায়, আর্থিক সমৃদ্ধি কিংবা উপস্থিত কোন বিপদ থেকে মুক্তির জন্ত লোকে এই পূজা মানত করে থাকে। যদি মানস পূর্ণ হয় তখন সে ঘটা করে এই পূজার অনুষ্ঠান করে। এই পূজার বিশেষত্ব এই যে, অতঃপর যতদিন সামর্থ্য কুলায় সে প্রতি বৎসর এই পূজা করতে বাধ্য থাকে। যখন সামর্থ্য চলে যায় তখন সে দেবতাদের কাছে মাপ চেয়ে পূজার ইতি টানে।

এই পূজাটা একটা মিশ্রিত বিশ্বাসের অনুষ্ঠান। এতে একাধারে চাকমা, ত্রিপুরা এবং মুসলমানী ধর্ম বিশ্বাসের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে।

এই পূজায় অহুইয়া, গরেইয়া এবং গাজী এই তিনজন দেবতার পূজা করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অহুইয়া চাকমাদের, গরেইয়া ত্রিপুরাদের আর গাজী মুসলমান ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক। এই পূজার জন্ত প্রথমে উঠানের একপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় একটা বড় বাঁশের চোড়া, ভিতরে একটা ডিম ঢুকিয়ে, মাটিতে পোতা হয়ে থাকে। তারপর পতাকা দণ্ডের মত দীর্ঘ একটা বাঁশের দণ্ড আন্তে করে চোড়ার ভিতর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে খাড়া করানো হয়। ঐ দণ্ডে নতুন নতুন খাদি, যেগুলো চাকমা মেয়েরা বুকে অড়িয়ে বাঁধে, সারি সারি ঝুলানো হয়ে থাকে। গৃহস্থ যত বছর এই পূজা করে, অনুক্রমে এই কাপড়গুলোর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে এই কাপড়গুলোর সংখ্যা গুণে যে কেউ বলে দিতে পারে গৃহস্থ কত বছর ধরে এই পূজা করে আসছে। পূজা শেষে কাপড়গুলো সমস্তে তুলে রাখা হয় পরের বছরে ব্যবহারের জন্ত। বাঁশের দণ্ডটি নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

এই পূজায় নয়টি মুরগী লাগে। তন্মধ্যে কমপক্ষে একটি মোরগ হওয়া চাই। অধিক সঙ্গতি থাকলে এই পূজায় পাঠাও বলি দেওয়া হয়ে থাকে। অঝা বা পুরোহিত আগ্নেয় পাতা ফেলে পূর্বোক্ত দণ্ডটির গোড়ায় এগুলি বলি দেয়। পূজা শেষে বলির মাংস রান্নাবান্না করে নিমজ্জিত অতিথিবির্গসহ মত্তপানের ভিতর দিয়ে ভুরিভোজ চলে।

সিন্দি

অনেকদিন আগে সিন্দি পুঁথি বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী নামে একটা পুঁথি বাজারে কিনতে পাওয়া যেত। পঞ্চাশের দশকে স্বর্গীয় হর কিশোর চাকমা এর অনুকরণে ভগবান বুদ্ধের সত্য পারামীকে ভিত্তি করে সত্যোর পাঁচালী নামে আরেকটি পুঁথি রচনা করেন। এটাও আর এখন পাওয়া

যায়না। চাকমা ভাষায় সিন্দি বাংলায় শির্নী। তখনকার দিনে চাকমাদের প্রায় ঘরে ঘরে হিন্দুদের দেখাদেখি সত্য নারায়ণের নামে শির্নী দেওয়া হত। মুসলমান সমাজেও তখন এ ধরনের একটা শির্নী দেওয়ার রেওয়াজ ছিল, আর তা' উৎসর্গ করা হত সত্য পীরের নামে। সত্য নারায়ণ আর সত্যপীর যেই হউন, উভয়ে তখন খুব জাগ্রত দেবতা বলে বিবেচিত হতেন। সন্ধ্যাকালে কিংবা এঁটোমুখে ভুলেও কেউ কখনও এই শির্নীর নাম মুখে আনতে সাহস করতো না। অকারণ এই পূজার কথা নিয়ে তোলাপাড়া করলে কিংবা শির্নী নিয়ে কেউ কখনও সামান্যতম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলে তখন নাকি সত্যি সত্যি কোন না কোন বিপদ দেখা দিত। হয়তঃ জঙ্গলে বাঘের উপদ্রব দেখা দেবে। পাড়া গ্রামে ওলাউঠা, বসন্ত ইত্যাদির মড়ক লেগে যাবে; নিদেনপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ কিংবা তার পরিবারের কারো না কারো প্রাণ হানি ঘটতে পারে।

নানা কারণে তখন লোকে শির্নী মানত করত। বিবিধ রকমের বিপদমুক্তি, জীবনাশঙ্কা, বৈষয়িক সমৃদ্ধি এমন কি ক্ষেতে পোকা মাকড়ের উপদ্রব নিবারণের জন্যও লোকে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের নামে শির্নী দিত। তবে বাঘের উপদ্রব নিবারণেই নাকি এই পূজার বিশেষত্ব। বিপদের গুরুত্ব অনুসারে লোকে একসঙ্গে একাধিক শির্নীও মানত করত। পুঁথির ভাষায় এই পূজার জন্ত,—

‘সোয়াসের ছুক লাগে সোয়াসের আটা,
সুপক কদলী লাগে সোয়াসের মিঠা।’

‘তা’ ছাড়া আঁখ’ নারিকেল, পান সুপারী এবং বিবিধ প্রকার ফুলও লাগে। তুলসী এই পূজার অপরিহার্য। একাধিক পূজা হলে সম পরিমাণ উপকরণ দিয়ে আলাদা আলাদা পূজা পাশাপাশি সাজাতে হয়। পূজার সময় প্রত্যেকটা পূজার শিয়রে এক একটা পিদিম জ্বলে আর লেখাপড়া জানা একজন লোক ব্রাহ্মণের ভূমিকা নিয়ে সুর করে পুঁথি পড়তে থাকে। এই সময় গৃহস্থ এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ পূজার কিছু না কিছু দক্ষিণা দিয়ে

থাকে। পূজায় প্রদত্ত পান সুপারী এবং এইসব দক্ষিণার পরস্যা পুঁথি পাঠকারী ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য। পূজা শেষে ছুধ, আটা, গুড়, কলা, নারিকেল ইত্যাদি একটা বড় পাত্রে নিয়ে শির্নী মাখানো হয়ে থাকে। তারপর গৃহস্থের জন্ত পরিমাণমত কিছুটা শির্নী রেখে দিয়ে বাকীটা পড়শীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। খাওয়ার আগে শির্নী প্রথমে মাথায় নিতে হয়। এই সময় শির্নী খাওয়ার জন্তে পাড়ার ছেলে পিলেদের মধ্যে এমন কাড়াকাড়ি ছড়োছড়ি লেগে যায় যে, তাই নিয়ে চাকমাদের মধ্যে একটা বাগ্‌ধারাই চালু হয়ে গেছে,—‘সিন্দি থিয়া গুরাগুন’ অর্থাৎ কিনা শির্নী থেকে বাচ্চারা। এই শির্নী যেখানে সেখানে ফেলা বারণ। উচ্ছিষ্ট সব কিছুই নদীতে দিয়ে আসতে হয়।

মুসলমান সমাজে শির্নী সিক্ক করে খাওয়া হয়ে থাকে। চাকমাদের মধ্যে কিন্তু কাঁচা খাওয়াই বিধি। ব্যাপারটা যদিও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে নয় তবু এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে শির্নী খেয়ে কারো কোনদিন সামান্যতম পেটের অসুখ করেছে, এমনটি কখনও শোনা যায়নি।

চাকমা ভাষায় সিন্দি নিয়ে মোট তিনটি বাগ্‌ধারা পাওয়া যায়।

যেমন,—১। ‘সিন্দি থিয়া গুরাগুন, যেটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২। ‘মানিক্যা বাবর সিন্দিখানা’—অর্থ, মানিকের বাবার শির্নী খাওয়া। অর্থাৎ যখন সে শির্নী খেতে গেল কিছুই আর তখন অবশিষ্ট নেই। এরূপ দেয়ী করা যাদের স্বভাব, ইংরৌতে তাদের বলা হয়, ‘Late Latif’।

৩। ‘সিন্দিলা’—অর্থাৎ শির্নী পূজায় দেওয়া খোসা ছাড়ানো কলার মত একেবারে উদোম গা।

ফানাচ্ বাতি

চাকমারা বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধ পর্বদিনে ফানাচ্ বাতি উড়িয়ে দেয়। ফানাচ্ বাংলায় ফানুস। একে আকাশ প্রদীপও বলা হয়ে থাকে। ফানুস উড়িয়ে দেওয়া বৌদ্ধদের এক ধরনের প্রদীপ পূজা। কথিত আছে, রাজ-কুমার সিদ্ধার্থ যখন গৃহত্যাগ করে আনোমা নদীর তীরে উপস্থিত হন তখন তখন প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্তু কহন্তে অসি দিয়ে নিজের ভ্রমর কৃষ্ণ কেশরাজি ছেদন করেন। মহাব্রহ্মা সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি মাটিতে পড়ার আগে স্বহস্তে গ্রহণ করে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান এবং সেখানে সেই চুল নিয়ে ‘চুলামনি চৈত্য’ নামে একটি চৈত্য স্থাপন করেন। চাকমারা, তথা সমগ্র বৌদ্ধ জগত ফানাচ্ বাতি অর্থাৎ আকাশ প্রদীপ ছেলে সেই চুলামনি চৈত্যের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করে থাকে।

আহ্জার বাতি

বিপদমুক্তি কিংবা রোগ মুক্তি কামনায় লোকে আহ্জার বাতি মানত করে। এ’টি আসলে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রদীপ পূজা। এই অনুষ্ঠান বৌদ্ধ বিহারে কিংবা স্বগৃহে সম্পন্ন করা যায়। আগেকার দিনে পুরোনো বৌদ্ধ পুরোহিত রুরিরাই এই পূজায় পুরোহিত্য করতেন। এই অনুষ্ঠানে আহ্জার বাতি অর্থাৎ এক হাজার বাতি জ্বালিয়ে বুদ্ধের পূজা করা হয়ে থাকে। এতে এক হাজার মোমবাতি অথবা ছোট ছোট মাটির চাটির উপর সলিতা দিয়ে এক হাজার সর্ষে তেলের পিদিম জ্বালানো হয়ে থাকে। চাকমারা এইরূপ পিদিমকে বলে ‘এইচাদি’। স্বগৃহে এই পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হলে প্রথমে বাড়ীর প্রাঙ্গণে খোলা জায়গায় চতুষ্কোণ

আকারে একটা পূজা মণ্ডপ তৈরী করে নিতে হয়। তার চারধারে জোড়ায় জোড়ায় খুঁটি পুঁতে বেশ কিছু বাঁশ লম্বালম্বি ছই ফালি করে চিরে সেগুলো খুঁটিগুলোর কাঁকে প্রস্থাকারে এমন ভাবে সারি সারি বেঁধে দেওয়া হয়, যা'তে প্রত্যেকটা বাঁশের ফালির খাঁজযুক্ত অংশটুকু উপরমুখো হয়ে থাকে। তারপর সেই খাঁজের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি অথবা 'এইচাদি' অর্থাৎ সরষে তেলের পিদিম বসিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ সন্ধ্যারাত্রে এই হাজার বাতি জ্বালানো হয়ে থাকে। তখন গৃহস্থ পরিজন ছাড়া বহু পাড়া প্রতিবেশী এ কাজে অংশ নিতে আসে এবং বাতি জ্বালানো কাজে সক্রিয় হয়ে পুণ্যাংশ গ্রহণ করে থাকে। অনেক এই অনুষ্ঠানের সময় ছয়েকটা ফানুসও উড়িয়ে দেয় এবং অনেক গৃহস্থ পরদিন ভিক্রু ভোজনের সঙ্গে লোকজনও খাওয়ায়।

ধর্মকাম

এই পূজার একাধিক নাম, যেমন,—ধর্মকাম, জাদিপূজা, শিবপূজা, সীবলী পূজা ইত্যাদি। আসলে এটা বুদ্ধশিষ্য লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী মহাস্থবিরের পূজা। এই পূজা এখন বৌদ্ধশাস্ত্র সন্মতভাবে বিহারে অথবা স্বর্গহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের চরম অবনতির যুগে মহাযানী বৌদ্ধ মতবাদেদের সাথে যখন হিন্দুদের তান্ত্রিক মতবাদেদের সংমিশ্রণ ঘটে তখন এই পূজা অনুষ্ঠানেও নিকৃতি দেখা দেয়। সীবলী পূজা হয়ে যায় শিবপূজা। ক্রমে ক্রমে বলিদান প্রথাও এই পূজার চলতি হয়ে পড়ে। তবে এই পূজা অনুষ্ঠানে যথাস্থানে বুদ্ধমূর্তি স স্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য। বছর সতের আগে ১২৭০ ইংরেজীর শেষভাগে ১০৩ নং বাকছড়ি মৌজার বড় কাটাছড়ি গ্রামে স্বর্গীয় হুলাল দেওয়ানের পুঁহে আমার একবার এরূপ এক পূজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। পূর্বোক্ত বৌদ্ধ পুরোহিত রুরিদের পৌরোহিত্যেই কেবল এই পূজা সম্পন্ন হতে পারে। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'আঘরতারা' আবৃত্তিও

এখানে অপরিহার্য। তাছাড়া এই পূজায় এমন কতকগুলো বিধিবিধান রয়েছে যার মূলে নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ মতাদর্শ নিহিত রয়েছে। যেমন পূজার সময় গৃহস্থের ঘরে বিংবা পূজা মণ্ডপে শুচি শুদ্ধ না হয়ে কেউ প্রবেশ করতে পারেনা। অ'র যতক্ষণ না পূজা শেষ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মদ, জগড়া প্রভৃতি নেশাপান প্রত্যেকের জন্য নিষিদ্ধ থাকে। এসব বিধি বিধান কোনটার বরখেলাপ ঘটলে পূজায় বিপর্যয় ডেকে আনে।

অতি বিপদে পড়ে লোকে ধর্মকাম মানত করে। সিন্দির মতই এই ধর্মকামও বাসি মুখে মুখে আনতে নেই। সাধারণতঃ যখন জুন্মের খান তোলা হয়, কাজকর্ম কমে আসে, এরূপ প্রশস্ত সময়ে একটা শুভদিন দেখে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। এতে পাড়ার সবাই যেমন নিমন্ত্রিত হয়ে থাকে তেমনি একাঙ্গে সবার সক্রিয় সাহায্যও পাওয়া যায়। পূজায় ৭টি মোরগ, দু'গা, ১টি শূকর, প্রচুর শুঁটকি মাছ আর বিবিধ রকমের তরিতরকারী লাগে। অনেকে মানত করার দিনই নিজের পালের একটা শূকরের বাচ্চাকে পূজার জন্য নির্ধারিত করে খাসী করে দেয়। সেটা বড় হতে থাকে আর গৃহস্থও ধীরে ধীরে তৈরী হতে থাকে পূজার জন্য, যেহেতু এটা খুবই ব্যয় বহুল ব্যাপার। এই পূজার জন্য নিমন্ত্রণ করে আগে ভাগে আলাদাভাবে মদ এবং বিশেষতঃ জগরা অর্থাৎ বিভিন্নধানের অপরিষ্কৃত মিষ্টি মদ বানানো হয়ে থাকে। চাকমাদের বিশ্বাসমতে এভাবে পূজার জন্য বানানো মিষ্টি জগরা দীর্ঘদিন রেখে দিলেও কিছুতে টকে যেতে পারেনা।

এই অনুষ্ঠানের দু'টি পর্যায় রয়েছে। দু'টি দু'দিনে সম্পন্ন করতে হয়। প্রথম দিন পিঠা খাওয়া আর দ্বিতীয় দিনে আসল পূজা। পিঠা খাওয়া পরবের জন্মে তেলেভাজা ও ভাংরে সিদ্ধ উভয় প্রকারের হরেক রকম চাকমা পিঠা প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা হয়ে থাকে। পিঠা খাওয়ার দিন সন্ধ্যাবেলা অনেকে আবার আহুতার বাস্তিও জ্বালিয়ে থাকে, ফায়ুস ওড়ায়। তবে সেটা মানত করা নিয়ে কথা।

পিঠা খাওয়ার পর সে রাত্রে মধ্যেই মুরগী, শূকর ইত্যাদি বধ করে আর শুটুকি এবং অন্যান্য সব ভরিতরকারী কুটনো কুটে নিয়ে পরদিন ভোরে ভোরে পূজার জন্ত রান্না চাপানো হয়ে থাকে। রুরিরা বলে থাকেন, মোরগ মুরগী এবং শূকর শিবের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় যে, অন্যান্য পূজার মত এগুলো বলি দেওয়ার পূর্বে আগ-পাতা ফেলে কোন দেবতার মতামত চাওয়া হয়না। মোরগ মুরগীতেও কোন বাছবিচার নাই। ইত্যাদি কারণে স্বভাবতঃই এই পূজার বলির বিধান নিয়ে প্রশ্ন জাগে।

রান্না করতে হয় বাড়ীর বাইরে কোন সুবিধাজনক স্থানে। পূজার জন্ত প্রথমে বাড়ীর উঠানে ৫ | ৭ জম লোক বসতে পারে মত একটা বাঁশের মাচান ঘর করতে হয়, যাকে বলে দানঘর। আসল পূজার জন্ত জায়গা করতে হয় এর থেকে কিছুদূরে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত চত্বরে, যেখানে আলাদা একটা পূজা মণ্ডপ তৈরী করা হয়ে থাকে। নির্বাচিত জায়গাটি পরিষ্কার করে আগে থেকেই মাটি আর গোবর দিয়ে উত্তমরূপে নিকিয়ে ঝকঝকে তক্তকে করে রাখা হয়। তারপর সেখানে জাকার বেড়া দিয়ে ঘিরে পূজা মণ্ডপ তৈরী করা হয়ে থাকে, যার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারদিকে চারখানা দরজা থাকে। এর কেন্দ্রস্থলে একই ধাঁচের আরেকটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রবৃত্ত তৈরী করে উভয় বেড়ার মাঝের ফাঁকা অংশটাকে চারভাগে ভাগ করা হয়। - কেন্দ্রস্থলের বৃত্তটি ফাঁকাই থাকে। সমস্ত ব্যাপারটা চতুষ্কোণ কিংবা গোলাকার বৃত্তও করা যেতে পারে। পশ্চিম দরজার মুখে বৃক্ষমূর্তি স্থাপিত হয়ে থাকে।

এই পূজায় একাধিক রুরির উপস্থিতি প্রয়োজন এবং এঁদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনিই এই পূজায় পৌরহিত্য করেন। তাকে বলা হয় 'গাখ্যা রুরি'। পূজার সময় তাঁকে 'আঘরতারা' থেকে গাখ্যা পাঠ করতে হয়, এজন্যই সম্ভবতঃ তাঁকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। দানঘরে পাঠ

করতে হয় 'মালেম তারা' আর পূজা মণ্ডপে পাঠ করতে হয় সাহসফুলু তারা' এবং 'ধা-পারামী তারা' (দান পারামী ?)। রান্নাবান্না হয়ে গেলে সমস্ত অন্নব্যঞ্জন প্রথমে দানঘরেই তোলা হয়। সেখান থেকে পরিমাণ মত নিয়ে পূর্বাহ্নের মধ্যেই পূজা মণ্ডপে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। প্রথমে কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহদাকারের অন্নকূট স্থাপন করে পূজা সাজানো হয়। বহির্ভাগের চার অংশে অন্নকূট স্থাপন করতে হয় প্রতি অংশে ষোলটা করে। তবে এগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের হয়ে থাকে। এগুলো দেখতে অনেকটা বৌদ্ধ চৈতোর মত, মগ ভাষায় যাকে 'জাদি' বলে। এ জন্তাই বোধ হয় এই পূজাকে জাদি পূজাও বলা হয়ে থাকে।

এ পূজার একটি অদ্ভুত সত্য আছে। পূজাতে একটি মাকড়সা আসবেই, না এলে পূজা সিদ্ধ হবে না। সেটি যদি আবার পূর্বদ্বারে ঢুকে পূজার যে কোন স্থানে জাল বুনে পশ্চিমদ্বারে বেরিয়ে যায় কিংবা রয়েছেই গেল 'ভিতরে' তবে গৃহস্থের পক্ষে অতি শুভ ফলদায়ক হয় বলে মনে করা হয়ে থাকে। মাকড়সা আসার আগে পূজায় মাছি বসলে সেটা অশুভ লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। পরে শত মাছি বসতে পারে, তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটে না। কোন কারণে পূজায় যদি মাকড়সার আবির্ভাব না ঘটে তবে গৃহস্থ পরিজন সহ রুরি লুখাক* সকলে মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে পূজা মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করতে হয়, যতক্ষণ না মাকড়সার আগমন ঘটে। তবে সাধারণতঃ এতদূর কষ্ট স্বীকার করতে হয়না। স্বাভাবিক ভাবেই পূজারম্ভ-কালে মাকড়সার আবির্ভাব ঘটে। এই রকম কোন পূজায় কখনও কোন মাকড়সা আসেনি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নি।

পূজা শেষে রুরি লুখাক সকলে এসে দানঘরে আসন গ্রহণ করেন। তখন অবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন ভাগ করে কিছুটা নিজেরদের জন্ত রেখে বাকীটা দশের খাওয়ার জন্মে মাটিতে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর তখন থেকে মদ, জগরা এবং খানাপিনা চলতে থাকে।

* রুরির সাহায্যকারী।

থান্‌মানা

সম্বৎসরে একবার প্রতি চাকমা পাড়ায় থান্‌মানা পূজা করা হয়ে থাকে। এ'টি একটি সমষ্টিগত পূজা। পাড়ার প্রত্যেক গৃহস্থই এতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। তবে বিশেষ কারণে কাউকে সমাজে একঘরে করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এই পূজায় অংশ গ্রহণ করার অধিকার থাকেনা। অনেকে একে গঙা পূজা বা গাঙ্পুক্ষাও বলে। এই পূজার উদ্দেশ্য বহুবিধ যেমন,—পাড়ার ধনৈশ্বৰ্য্য বৃদ্ধি, রোগ মহামারী ইত্যাদি থেকে পরিত্ৰাণ, অজন্মার সমস্ত সৃষ্টি কামনা—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পূজা ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত আছে যদিও পূজা পদ্ধতিতে কিছুটা বিভিন্নতা রয়েছে।

চাষের ধান গোলায় উঠলে সুদিনে সুক্লে পাড়ার পাড়ার এই সম্মিলিত পূজা অমুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এ পূজায় একসঙ্গে চৌদ্দজন দেবদেবীর পূজা করা হয়। তাদের মধ্যে প্রধানা হলেন পূর্বে বর্ণিতা গঙাদেবী। তারপরে আছেন বিরাডা, যিনি গঙার স্বামী, ভূত, যিনি একাধারে গঙার ছেলে এবং সেনাপতি, আহুত্যা, মোত্যা, বড়শিল, মগনী আর সাতবোন কুঙরী বা কুঙারী। যথা :—ব-ত্ কুঙারী (শীতলা দেবী), জুরো কুঙারী (ওলা দেবী), শিব কুঙারী, বিনি কুঙারী, ওলু কুঙারী, ফুল কুঙারী এবং ক কুঙারী। এ'রা বিবিধ রোগ ব্যাধির জন্ত দায়ী। একই ভূমিকা নিয়ে এই সাতবোন কুঙারী পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও পূজিত হয়ে থাকেন।

পাড়ার লোকের সামর্থ্য বিবেচনা করে প্রথমে পূজার জন্ত একটা বাজেট তৈয়ার করে নিতে হয়। ঐ হিসেবে প্রত্যেকের বাড়ী থেকে টাকা উঠিয়ে পূজার জন্ত শূকর পাঁঠা ইত্যাদি যাবতীয় পূজার উপকরণ কেনা হয়ে থাকে। অবস্থা বিবেচনা করে অনেক সময় এই পূজায় গঙার নামে মোষও

বলি দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট দিন সকালবেলা পূজোপকরণগুলো নিয়ে পাড়ার লোক ঘাটে এসে জড় হয়। এখানে জলের কিনারায় পূজার জন্ত প্রায় কোমর সমান উঁচু একখানা বাঁশের মাচান তৈরী করে তার উপর মাটি দিয়ে পূজার বেদী তৈরী হয়। বেতের ধ্বজা আর নামা রকমের বেতের কারুকাজ দিয়ে এটাকে তখন সাজানো হয়ে থাকে। এরপর অঝো মন্ত্রপাঠ করে 'আগ্নিপাতা' ফেলে এক এক দেবতা এবং দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দিতে শুরু করে। গঙা আর আহুত্যা ও মোত্যা'র জন্ত পাঁঠা, ভুতের জন্ত শূকর বড়-শীলের জন্য কবুতর, মগনীর জন্য হাঁস (অভাবে মুরগী) এবং বাকীদের সবার জন্য এক একটা মোরগ বলি দিতে হয়। গঙার জন্য মোষ বলি দেওয়া হলে মোত্যাও তাতে অংশ পায়। গঙা শূকর বলি গ্রহণ করেন না, ভুতের আবার পাঁঠা চলেনা,—এমনি বাছবিচার রয়েছে এদের মধ্যে। কথিত আছে, বিয়াত্রার নিষেধ আছে বলেই গঙা শূকর বলি গ্রহণ করেন না, কিন্তু খাওয়ার বিষয় লোভ আছে। তাই অনেক সময় মরণাপন্ন রোগীর রোগ-মুক্তির জন্য শূকরের গায়ে পিটুলি মাখিয়ে গঙীর রাজে সকলের অগোচরে এবং সম্ভবতঃ বিয়াত্রারও অগোচরে সাদা শূকর গঙার নামে বলি দেওয়া হয়। এভাবে স্বামী ভাঁড়িয়ে শূকর খেয়ে গঙা নাকি খুঁই ঐতিহ্যে থাকেন। তাই অনেক সময় রোগী নাকি ধীরে ধীরে নিরাময় হয়ে উঠে।

পূজা শেষে সাধারণতঃ গ্রামের প্রান্তে কোন ছায়া বহল বড় গাছের নীচে বলি দেওয়া পশুপাখীর মাংস রান্না করা হয়। এখানে কিন্তু ভাত রান্না করা হয়না। এটাও এই পূজার বিশেষত্ব। মাংস রান্না হয়ে গেলে পাড়ার ছেলে বৃদ্ধো সবাই যে যার বাড়ী থেকে ভাত এনে এখানে সরকারী ভোজে শরিক হয়। ভোজের সময় মদ অপরিহার্য আর সেটা প্রায় প্রত্যেক বাড়ী থেকেই প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

এই সমষ্টিগত পূজা আর সম্মিলিত ভোজের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের মধ্যে একতা, সহযোগিতা আর ভ্রাতৃত্ব মনোভাব বৃদ্ধি পায়। এটা

যেন পূজার ভিতর দিয়ে গ্রামের সকলের আনন্দের জন্য একটা পিকনিকের বিধান দেওয়া হয়েছে। এতে আর কিছু না হোক সম্বৎসারে অন্ততঃ একবার সমস্ত গ্রামবাসী একত্রে মিলে সব কাজ, সব চিন্তা ভাবনা একপাশে ফেলে রেখে সারাদিন প্রচুর আনন্দ উল্লাস আর হৈ হুল্লার মধ্য দিয়ে অবকাশ যাপনের সুযোগ পায়।

মালেইয়া

মালেইয়া ঠিক কোন পূজা পার্বণ নয়। এ'টি চাকমাদের একটা প্রাচীন সামাজিক রীতি, এখন প্রায় লোপ পেতে চলেছে। এতে কোন দেবতার পূজা হয়না। কোন গৃহস্থ যদি কোন কাজে পিছিয়ে থাকে, ইচ্ছে করলে সে পাড়ার লোকের সাহায্য নিতে পারে। হয়তঃ কোন কারণে কাণ্ড জুম কাটা দেয়ী পড়ে গেছে ; ঠিক সময়ে জঙ্গল কাটা না হলে কাটা জঙ্গল শুকাবেনা, ভালো পোড়া যাবেনা, ফলে ভাল ফসলও হবেনা। তখন পাড়া পড়শীর সাহায্য নিয়ে সে কাজে সমতা আনতে পারে। সেক্ষেত্রে সে পাড়ার ঘরে ঘরে গিয়ে সাহায্যে আবেদন জানিয়ে আসে। তার পরদিন প্রতি বাড়ী থেকে দা' কুড়াল নিয়ে এক একজন লোক এসে তার কাজটা একদিনেই সম্পন্ন করে দিয়ে যায়। এদের কোন মজুরী দিতে হয়না, শুধু খানাটা দিলে চলে। তা' অবশ্য একটু ভালোই দেওয়ার রেওয়াজ আছে। তখন এ উপলক্ষে সে বাড়ীতে ছোটখাট একটা ভোজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। গৃহস্থের অসচ্ছলতা থাকলে কিন্তু অনেক সময় এমনিই সবাই কাজ করে দিয়ে আসে। জুমে নিড়ানি দেওয়ার বেলায় কিংবা ফসল কাটার সময়ও মালেইয়া ডাকা যায়। নিঃসন্দেহে এ'টি একটি খুব ভালো প্রথা। এতে পারস্পরিক সহানুভূতি আর সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়, সামাজিক বান্ধন সুদৃঢ় থাকে। এক কথায় এই প্রথা

প্রাচীন চাকমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় বহন করে। এমন সহজ ভাষ্যবোধ একমাত্র উপজাতীয়দের মধ্যে ছাড়া বোধহয় সভ্য জগতে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

এই এসঙ্গে পুরোনো দিনের মিজোদের একটা ব্যাপার এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে মিজোদের মধ্যে কারো কোন অপরাধে জেলের হুকুম হলে তখন তার যতদিনের জেলের মেয়াদ তার ততজন আত্মীয় এসে জেলে কাজ করে দিয়ে দিনে দিনে তাকে খালাস করে নিয়ে যেত। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টও তাদের সরলতা দেখে তাই মেনে নিতেন। এটাও তাদের এক ধরনের ম'লেইয়াই বলা চলে।

আহ্ল পালানী

প্রত্যেক বৎসর ৭ই আষাঢ় অম্বুবাচী প্রবৃত্তি থেকে তিন দিন চাকমারা হালচাষ বন্ধ রাখে। হিন্দুধর্মে এই সময় বসুন্তী ঋতুমতী হয় আর তার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে শস্যধারণ ক্ষমতা জন্মে। এই কয়দিন হালকর্ষণ কিংবা কোন প্রকার মাটি খোঁড়াখোঁড়ি নিষিদ্ধ। এই সময় চাকমারা অন্য কোন কাজকর্ম কিংবা মজুরীও করেনা। সবাই বাড়ী বাড়ী ঘুরে মদ খায় আর আমোদ ফুটি করে অবসর যাপন করে। এই সংসবকে বলে 'আহ্ল পালানী'। অর্থনৈতিক কারণে তিনদিন কাজকর্ম বন্ধ রাখা এখন অবশ্য সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই কেউ কেউ হয়তঃ একদিন মাত্র এই উৎসব পালন করে থাকে।

মাথাধুয়া

মাথাধুয়া অর্থ মাথাধুয়ে ফেলা, গুট অর্থে পরিশুদ্ধ হওয়া। যখনই কোন চাকমা গৃহস্থ মনে করে যে কোন কারণে তার 'ফী বলা' অর্থাৎ

বালা মুছিবত বা আপদ বালাই উৎপন্ন হয়েছে, তখন এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় গৃহ পরিজন সহ পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমষ্টিগত ভাবে একই গোষ্ঠীভুক্ত ভাষ্য লোকজন সবাইকে এভাবে পরিশুদ্ধ হ'তে হয়। এ অনুষ্ঠানকে 'বু'শারা' অনুষ্ঠানও বলা হয়ে থাকে। চাকমা অথবা বৈষ্ণবদের মতে বারো রকমের ফী বলা রয়েছে। যথা :—

১। চাং ফী :—মগ ভাষায় চাং অর্থে হাতী। কারো ঘর হাতীতে ভেঙ্গে দিলে গৃহস্থের এই ফী বলা উপস্থিত হয়।

২। মাং ফী :—মগ ভাষায় মাং অর্থে রাজা। কোন সাধারণ প্রজার ঘরে দৈবাৎ রাজার পদার্পণ ঘটলে সেই প্রজার ঘরে এই ফী বলা উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে রাজাকে তখন সেই প্রজার আপদ বালাই কাটানোর জন্তে তাকে খীসা কিংবা কার্বারী পদ দিয়ে সমাজে উন্নীত করতে হয়। অন্যথায় সামাজিক বিধিমতে এই ফী বলা দূর করার জন্তে আনুষ্ঠানিক যাবতীয় ব্যয়ভার রাজাকেই বহন করতে হয়।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, উপরোক্ত 'চাং' এবং 'মাং' এই মগী শব্দ দুটির কিভাবে এখানে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার কোন হিন্দিস পাওয়া যায়না। শুধু এই পূজা ছাড়া চাকমা ভাষায় আর কোথাও এই শব্দ দুটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়না।

৩। চিল ফী :—কোন গৃহস্থের ঘরের চালে যদি চিল শকুন বসে, তার এই ফী বলা উপস্থিত হয়। এই যদি ব্যাপার প্রথমে বাইরের কোন লোকের চোখ পড়ে তবে তার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, ঐ বাড়ীতে গিয়ে ঘরের খুঁটি কিংবা বেড়া যা'হোক কিছু একটা ছুঁয়ে তদন্তেই বাড়ীর মালিককে এ বিষয়ে অবহিত করা। অন্তর্ধায় এই ফী বলা তার গায়েই লাগে।

৪। শিগিরী ফী :—অনুরূপ ভাবে কোন গৃহস্থের ঘরের চালে বাজপাখী বসলে উপরোক্ত একই বিধান প্রযোজ্য।

৫। পেজা ফী :—কারো ঘরে যদি হঠাৎ পেঁচা ঢুকে পড়ে তখন সেই ঘরে এই ফী বলা উপস্থিত হয়।

৬। উই ফী :—কারো ঘরে কচ্ছলা উইপোকা উঠলে সেই ঘরে এই ফী বলা উপস্থিত হয়।

৭। শুই ফী :—কোথাও ব্যক্তির সমর কেউ যদি হাত পা উপরমুখো করে অস্বাভাবিক ভাবে স্থিত মৃত গোসাঁপ দর্শন করে তবে সেই ব্যক্তির এই ফী বলা উপস্থিত হয়।

৮। বিদ্যা ফী :—বিয়ে করলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের এই ফী বলা উপস্থিত হয়। সব বিবাহিত যুগে এই ফী বলা দুরীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খোজান্তরিত করা হয়। তৎপূর্বে বর কিংবা বধু উভয়ের কারো বাড়ীতে প্রবেশ করা নিষেধ।

৯। বিয়াল ফী :—সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির এই ফী বলা উপস্থিত হয়।

১০। মাতৃদশা :—মাতার মৃত্যুতে এই ফী বলা উপস্থিত হয়।

১১। পিতৃদশা :—পিতার মৃত্যুতে এই ফী বলা উপস্থিত হয়।

১২। গুরুদশা :—গুরুর মৃত্যুতে এই ফী বলা উপস্থিত হয়।

এই ষাটো রকমের ফী বলা ছাড়া আরো অনেক প্রকার 'দৈব ছবিপাক' গৃহস্থের অকল্যাণ সূচিত হয় বলে চাকমাদের বিশ্বাস। সেক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়ায় গৃহস্থকে পরিতুষ্ট হতে হয়। যেমন,—বাড়ীস্থ কেউ মারা গেলে, ঘরে আগুন লাগা কিংবা বজ্রপাত হলে, কারো মুরগীতে যদি নরম ডিম দেয় ইত্যাদি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঘরে ফী বলা লাগে। কারো কলার হুড়া গদি আপনা আপনি গাছ থেকে ছিঁড়ে পড়ে কিংবা অস্বাভাবিক ভাবে গাছের কাণ্ড চিরে খোঁড় মোচা বার হয় অথবা একটা হুড়া বার হবার পর

কিছুদূর ব্যাধানে একই বোঁটার দ্বিতীয় ছড়া আসে, কারো ঘরের চালে যদি দৈবাৎ কুকুর উঠে, তাতে গৃহস্থের পরম অকল্যাণ সূচনা করে। এই সমস্ত ব্যাপার যদি প্রথমে বাইরের কোন লোকের চোখে পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে গৃহস্থের কাছে গিয়ে জানাতে হয়। অন্যথায় তারও একই ফী বলা উপন্ন হয়। উড়ন্ত মোমাস্থি যদি কাউকে কামড়ে দেয় তাকে ঐ লোকটার সমুদ্র বিপদ বলে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে। আর কাউকে কুমীর কিংবা বাঘে নিয়ে গেলে তার গোষ্ঠীভুক্ত লোকজন সবাইকে পরিশুদ্ধ হতে হবে। তখন কিন্তু সকলে সমবেতভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়।

পূর্বোক্ত কোন কারণে ফী বলা উপন্ন হলে গৃহস্থের পক্ষে মাধাধুরা বা বুরপারা প্রক্রিয়ার পরিশুদ্ধ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় গৃহের যে কোন সদস্যের অপমৃত্যু, ধনহানি, রোগভোগ ইত্যাদি বিবিধ অমঙ্গল ঘটতে পারে। মাধাধুরা অনুষ্ঠান অব্যবহার পৌরহিত্যেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই পূজার উপকরণ হলো (১) ঘিলা (২) কজই (৩) ইরিং, সোনা (অভাবে কাঁচা ইলুদ), রূপা, ছটি মোরগ একটি মুরগী বা মুরগীর বাচ্চা ইত্যাদি। সাধারণতঃ দিনের বেলা এই পূজা করা হয়ে থাকে। অথবা প্রথমে সবাইকে ঘরের বাহির করে দেয়। পূজার সময় ঘরে আগুন রাখা নিষেধ, তাই খড়ের বেণীতে করে ঘরের আগুন বাইরে এনে চুলোর আগুন নির্ভিয়ে ফেলা হয়। বেণীর আগুন নিভে গেলে কিন্তু মুস্তিল। পূজা শেষে তখন অগ্নির কাছ থেকে আগুন কিনে জানতে হয়। এরপর অথবা ঘরে দৌরে মস্তপুত পানি ছিটিয়ে, দরজা জানালা বন্ধ করে, মাচান ঘর হলে সিঁড়ি উপর করে বাড়ীর বার হয়ে আসে এবং পূজার উপকরণাদি সহ সবাইকে নিয়ে ঘাটে যায়। এই সময় চোরে যাতে কোন কিছু চুরি করতে না পারে কিংবা কেউ বাড়ীতে ঢুকতে না পারে সেজন্তে একজন বিশ্বাসী আত্মীয় বাইরে থেকে ঘর পাহারা দিতে থাকে।

ঘাটে গিয়ে অথবা পানিতেই চারটি বাঁশের খুঁটি পুটে তার উপর ছোট একখানা মাচান তৈরী করে তাতে মাটি দিয়ে একটা টিবি বানায়। টিবির

উপরে বিয়তখানেক লম্বা কয়েকখানা মাধায় ফুল কাটা বাঁশের ককি পুঁতে দেওয়া হয়। এগুলো দেখতে অনেকটা মোরগের ঝুটির মত। এগুলোকে বলে, 'মারেই'। মোটামুটি এই হল পূজার বেদী। অথবা তারপর আগ-পাতা ফেলে একটি একটি করে মোরগগুলো বালি দিয়ে সেগুলোর রক্ত আর মাড়িভুঁড়ি পূজা বেদীতে মত্ত পানীয় সহযোগে দেবতার নামে নিবেদন করে। এই পূজায় তিনজন দেবদেবীর পূজা করা হয়ে থাকে। যথা :—গণ্ডা, গণ্ডার স্বামী বিয়াডা আর ভুত, যে একাধারে গণ্ডার ছেলে এবং সেনাপতি। এই তিনটি দেবদেবীর পূজার পর অথবা একটি বাঁশের চোঙায় ঘিলা, কজই, ইকিং, সোনারুণা ইত্যাদি উপকরণ পুরে নিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে শ্রোতের নিয়মুখী হয়ে চোঙাতে জল ভর্তি করে। তারপর ঐ মন্ত্রপুত জল দিয়ে বয়সানুক্রমে প্রথমে বাড়ীর প্রত্যেক পুরুষ সদস্যের নাম ধরে ডেকে সাতবার 'শুক। শুক।' ইত্যাদি মন্ত্র পড়ে তার ডানদিকের জুলফির চুল ধুইয়ে দেয়। এরপর অম্লমগ্ন ভাবে মেয়েদের বাম জুলফি ধোয়া হয়। কোন পানি কিন্তু এ সময় মাটিতে পড়তে দেওয়া হয়না। অথবা সব সময় একটা নতুন টাকিতে ঐ সব জল ধরে রাখে (তার) আর পরে হাঁড়িভুক্ত জলে ভাসিয়ে দেয়। সবাইকে পরিশুদ্ধ করার পর অথবা অবশিষ্ট মন্ত্রপুত জলসহ তাদের মিয়ে পরে ফিরে আসে। প্রথমে অথবা ঘরে ঢুকে আগের মত ঘরে দোরে মন্ত্রপুত জল ছিটিয়ে দ্বিতীয়বার পর পরিশুদ্ধ করে। এরপর সবাই ঘরে প্রবেশ করতে পারে। অথম বালি দেওয়া মুরগীর মাংস রান্নাবান্না করে খুমসে খানাপিনা চলে।

বিয়ালা কী অর্থাৎ প্রমুত্তির ব্যাপারে কিন্তু পুরোপুরি এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয় না। নব জাতকের নাভি করে গেলে যে কোনদিন, যে খাই ছেলে খালাস করে, সে এসে ঘিলা, কজই আর সোনারুণার পানি দিয়ে প্রমুত্তিকে শুদ্ধ করে দিলেই সে পাকস্পর্শ করতে পারে। এ অনুষ্ঠানের নাম 'কজই পানি লনাহ'। আগেকার দিনে স্ত্রী অথাকে এ বাবদ ১ কুম

চাল, ১ বোতল মদ, ১টি মোরগ আর একখানা খাদি পারিতোষিক দেওয়ার নিয়ম ছিল।

- (১) এক প্রকার বুনো লতার ফল। এগুলি চাকমা ছেলেমেয়েদের প্রিয় খেলার উপকরণ। আসল ফলটা কিন্তু হাত ছুয়েক লম্বা। এর অনেক-গুলো খোপ এবং প্রত্যেকটা খোপে এক একটা ঘিলা থাকে। এই লতার ফুল দেখা যায় না। হঠাৎই একদিন ফল দেয়। চাকমাদের বিশ্বাস, ঘিলা লতায় ছাড়া প্রমাণ অপূর্ব সুন্দর ফুল হয়। কিন্তু দেবংশী বলে মনুষ্য চোখে তা দেখা যায়না। যে লোক দৈবাৎ দেখতে পায় সে নাকি রাজা কিংবা তৎসমতুল্য কেউ কেটা হয়ে যায়।
- (২) এক প্রকার গুল্ম জাতীয় কাঁটা গাছের ফল, দেখতে অনেকটা তেঁতুলের মত।
- (৩) তুর্বা জাতীয় ঘাস।

জুম মারানা

চাকমারা জুম করে। কিন্তু যেখানে সেখানে নয়। কতকগুলো নিষিদ্ধ জায়গা আছে। যেখানে জুম করা যায়না। যথা :— ন টানা, ধম্বক্গাত্, বাদোল খাত্, ভো ধুলোন্, আহ্জা, বিয়াত্রা ভিদা ইত্যাদি। এইসব নিষিদ্ধ এলাকায় জুম করার একমাত্র পরিণতি হল মৃত্যু। হরতঃ বাড়ীর সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নতুবা পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের অবধারিত মৃত্যু হতে পারে। কোন জায়গায় জুম করার সময় এভাবে বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ অথবা সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের দৈবাৎ মৃত্যু ঘটলে সেই জুমের জায়গা ভবিষ্যতের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ জেলায় এমনি বহু জায়গা রয়েছে,

যেখানে কেউ জ্বুয় করতে সাহস করেনা। এই নিষিদ্ধ জায়গাগুলোর শুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় ‘জ্বুয় মারানা’। এ কাজের জন্তে বিশেষ অঝা আছে। সাধারণ অঝারা এ কাজে দক্ষ নয়।

উপরোক্ত জায়গাগুলো কি কারণে জ্বুয়ের অন্ত দোষাবহ হয়ে গেল তার পেছনে একটা কাহিনী আছে। কথিত আছে, কোন এক রাজার ছই ছেলে আর ছই মেয়ে ছিল। রাজার মৃত্যুর পর রাজ্য নিয়ে হুঁভায়ের মধ্যে যখন মরণপণ সংগ্রাম চলছে এমনি সময়ে তাদের নিরস্ত করার জন্ত রাজকন্যা হুঁভাইয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় আর সাথে সাথে যুদ্ধোন্মত্ত হুঁভাইয়েরই অস্ত্রাঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার পতনে ছই ভাইয়ের চৈতন্যোদয় হল। তখন ছই ভাই তাকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করতে থাকে। সে ছিল আবার বিষকন্যা*। যেহেতু তার সর্বাঙ্গে বিষ—তার মৃত্যুতে তার দেহের বিষ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। মৃত্যুর সময় রাজকন্যা তার এই বিষ থেকে রক্ষা পেতে হলে সেই সব বিষাক্ত জায়গা কি ভাবে শুদ্ধ করে নিতে হবে তার একটা বিধান দিয়ে যায়।

* প্রাচীন ভারতে এক রাজার অপর শত্রুরাজাকে কৌশলে ঘারেল করার জন্ত কোন স্ত্রী সুলক্ষণা মেয়ে সংগ্রহ করে তাকে শিশুকাল থেকে খাতির গড়ে অন্ন অন্ন করে বিষ খাইয়ে মানুষ করে তুলতেন। বয়সের সাথে বিষের মাত্রাও বাড়িয়ে দেওয়া হত। এমনকি করে করে বয়স প্রাপ্ত হলে সে যেকোন পরিমাণ বিষ হজম করার শক্তি লাভ করত। কারণ তখন তার সর্বাঙ্গে বিষ, প্রতি নিশ্বাসে বিষ। এদিকে তাকে আবার নাচে গানে বিবিধ শিরকলার পারদর্শিনী করে একজন মোহময়ী স্বর্গের অঙ্গরী করে গড়ে তোলা হত। কোন শত্রু রাজাকে ধ্বংস করতে হলে কৌশলে তার সাথে বিষকন্যার মিলন ঘটিয়ে দিলেই হলো; উভয়ের দৈহিক মিলনে রাজার মৃত্যু ছিল অবধারিত।

কাহিনীটা অনেকটা বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ খণ্ডিত হওয়ার ঘটনার মত। রাজকন্যার মৃত্যুর পর তার পিঠ যেখানে গিয়ে পড়ে সেখানে সৃষ্টি হল 'ন টানা'। 'ন' মানে হল নৌকা। পাহাড়ের কোন অংশে কোন জায়গা যদি লম্বালম্বি হঠাৎ ঈষৎ বসে যায় আর তা' দেখতে যেন কেউ তার উপর দিয়ে একটা নৌকা টেনে নিয়ে গেছে এরূপ দেখায়, তখন সেটাকে বলা 'ন টানা'। দেখতে অনেকটা মানুষ শিরদাঁড়ার নীচু অংশটার মত।

চোখ দু'টি যেখানে যেখানে পড়ে সেখানে সৃষ্টি হল 'খম্বুগাত্'। কোন প্রকাণ্ড গর্ত যখন খাড়া ভাবে সোজা হুজি মাটির গভীরে চলে যায় তখন তাকে বলা হয় 'খম্বুগাত্'। বৃহৎ উচ্চ পতনেও এরূপ গর্তের সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্তে অনেকে এরূপ 'তায়্যাপোজ্যা গাত্' বলে।

রাজকন্যার নাক যেখানে পড়ে সেখানে সৃষ্টি হল 'বাদোল খাত্'। অর্থাৎ কিনা বাহুড়ের গুহা। পাহাড়ের গাঁয়ে স্থানে স্থানে এরূপ বহু গুহা দেখা যায়, সেগুলো সূড়ঙ্গের আকারে বহুদূর চলে গেছে। এইসব অন্ধকার গুহায় সাধারণতঃ বাহুড়, চামচিকা ইত্যাদি আধারের প্রাণীরা দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে। পাহাড়ের গাঁয়ে এসব গুহা সবসময় ঠাণ্ডা স্নাতস্ন্যেতে থাকে বলে গরমের সময় এগুলোর ভিতর থেকে বহির্মুখী মুছ ঠাণ্ডা বাতাস বয়। চাকমারা এই বাতাসকে বলে 'গাতের নিখাস'। এই বাতাস বাস্তবিকই দূষিত এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী।

কানগুলো যেখানে যেখানে পড়ে সেখানে সৃষ্টি হল 'তৌ ধুলোন্' অর্থাৎ দৈত্যের দোলনা। কোন প্রকাণ্ড লতা যখন ছড়ার এপাড়ের গাছ থেকে সোজা ওপারের কোন গাছে গিয়ে বেয়ে উঠে তখন তাকে বলা হয় 'তৌ ধুলোন্'।

সব শেষে স্ত্রী অঙ্গ যেখানে গিয়ে পড়ে সেখানে সৃষ্টি হয় 'আহুজা' (Salt petre) এ জেলার যেখানে সেখানে 'আহুজা' দেখা যায়। ঐগুলোতে

হাতী থেকে শুরু করে নানা জাতের পশুপাখী নানা খেতে আসে। এসব আরগার জুম করলে কিংবা কিছু শিকার করে রক্তপাত ঘটালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কুষ্ঠরোগ হয় বলে চাকমাদের বিশ্বাস।

চারধারে সমতল জমি, মাঝখানে হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে একটু উঁচু ভিটে থাকে বলা হয় ‘বিয়াত্ৰা ভিধা’ অর্থাৎ বিয়াত্ৰা দেবতার ভিটে। আগেই বলা হয়েছে ইনি হলেন গঙা দেবীর স্বামী এবং তাবৎ ভূত প্রেতের জনক। তাঁর ভিটেতে জুম করতে যাওয়া আশুপঙ্কার বিষয়ই বটে।

যত রকমের জুমের দোষ আছে, গর্ভগুলো তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। এগুলোর দোষ অনেক সময় কাটান যায়না। তাই পারতপক্ষে এগুলো বাদ দিয়েই জুম করা হয়। এগুলোর দোষ কাটান দিতে হলে শূকর, মোরগ ইত্যাদি বলি দিতে হয়। অথবা বিধিমাতে আগ্নাতা ফেলে গর্ভের মুখে বলি দেয় এবং মন্ত্র পড়ে গৃহবাসী দেবতাকে আহ্বান করে। এসময় গর্ত থেকে সাপ, ঝাঙ, শতপদী, বৃশ্চিক, মাকড়সা, কাঁকড়া ইত্যাদি যা কিছুই বেরিয়ে আসুক তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলতে হবে। তা’ যদি সম্ভব না হয় তবে অথবা আর গৃহস্থের ভবিষ্যত সঙ্কটাপন্ন হয়, এমনকি তাদের মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী ধরে নেওয়া যায়।

বাকী দোষগুলো নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় কাটান দেওয়া যেতে পারে উপকরণ,—পাঁচ রকমের শাকপাতা, একটি সুঁচালো বাঁশ, তীর ধনুক, এক-খানা কোদাল ইত্যাদি। অথবা বিধিমাতে ‘আগ্নাতা’ ফেলে শাকপাতা-গুলো দিয়ে পূজা করে, তারপর দেবতার উদ্দেশ্যে বলতে থাকে,—‘তোমার ভোগ তোমাকে দিলাম। তুমি এই জুমের মালিকের অনিষ্ট করবেনা। যদি কর, তবে আকাশেও যদি যাও এই তীর ধনুক নিয়ে তোমাকে মারবো। পাতালে যদি যাও এই কোদাল দিয়ে খুঁড়ে বার করবো। আর গাছের আগায় উঠলেও তোমার নিস্তার নেই,—সুঁচালো বাঁশ দিয়ে তোমার এঁকোঁড় এঁকোঁড় করে ফেলবো। তুমি এখনই আমার হুকুমে এখান থেকে চলে যাও।

কেমন, যাবেতো ? তারপর নিজের মুখেই ‘যাচ্ছি যাচ্ছি,—’ বলে অঙ্গভঙ্গি সহকারে দেখায় যেন সত্যি সত্যি কেউ চলে যাচ্ছে।

পূর্বোক্ত দোষগুলো ছাড়া জুমের জন্তু জঙ্গল কাটার সময় সেখানে যদি মরা বাঁদরের মরা বাঁদরের মাথার খুলি কিংবা মরা পাখী পাওয়া যায় তবে সেই জুম ছেড়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, বাড়ীর কেউ না কেউ পাগল হয়ে যাবে। জুম কাটার সময় ভূমিকম্প হলে সে জুমও পরিত্যাগ করা হয়। নতুন বাড়ী করার সময় ভূমিকম্প হলেও তা ভেঙ্গে আবার নতুন করে কাজ শুরু করা হয়ে থাকে। জঙ্গল কাটার সময়ে জুনে দা’ শানু দেওয়ার পাথর যদি শানু দিচ্ছে ছ টুকরো হয়ে যায় তবে সে জুমও অবশ্য পরিত্যাজ্য। এ সমস্ত দোষ দূর করার জন্তু কিন্তু কোন বিধি বিধান নেই।

কুলুক্ মারানা

অমেক সময় দেখা যায় কারো কারো গায়ে দাদ, খাজুলি, একজিমা ইত্যাদি চর্মরোগ বছরের পর বছর লেগেই আছে। শত ঔষধ প্রয়োগ, হাজারো চিকিৎসাতেও এসব রোগ কিছুতেই যেন আর ভালো হতে চায়না। চাকমার রোগের অবস্থাতে বলে,—‘কুলুক্ লাগানা’। ‘কুলুক্’ অর্থ দূষিত স্থান যেমন, আহুজা, পচা নর্দমা, পচা ডোবা, বন্ধ জলাভূমি ইত্যাদি। এসব জায়গা স্বভাবতঃই দূষিত এবং বিবিধ রোগ জীবাণুর প্রজনন কেন্দ্র। চাকমা বিশ্বাসমতে রোগগ্রস্ত ব্যক্তি হয়তঃ কোন এক সময় এরূপ কোন দূষিত স্থানে পা দিয়েছিল আর সেখান থেকেই তার গায়ে এই রোগ সংক্রামিত হয়ে পড়ে। চাকমা অথবা বৈষ্ণৱা তখন বিশেষ পূজা পদ্ধতির মাধ্যমে এসব রোগ নিরাময় করে থাকে। এই বিশেষ প্রক্রিয়ার নাম ‘কুলুক্ মারানা’। অনেকে একে ‘খাং বানানাহ্’ও বলে। কারো গায়ে যদি এরূপ কোন রোগ দেখা দেয়, তবে প্রথমে রোগের উৎপত্তিস্থল

নির্ণয় করতে হয়। বিবিধ উপায়ে এটা করা হয়ে থাকে। কোন কোন অঝা খড়ি (কড়ি) চালান দিয়ে, কেউ নখ দর্পণ প্রক্ৰিয়ায়, কেউবা গোণা-গাথা করে নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজে বার করে। রোগীকে নিরাময় করতে হলে তখন ঐ জায়গায়, তা সে যত নোংরা জায়গাই হোক - গিয়ে পূজা দেওয়া অবশ্য কৰ্তব্য।

চাকমা অঝা বৈজ্ঞানিকের মতে গড়া, খগিনী, মগনী ও নারেন্ডা এই চারিজন দেবতা বা অপদেবতার যে কোন একজনের কারণে উপরোক্ত চর্ম-রোগাদি উৎপন্ন হয় এবং সে কারণে তার সন্তুষ্টি বিধান ছাড়া কোন ঔষধই এই সমস্ত রোগে কার্যকরী হতে পারে না। যখন যে দেবতার কারণে রোগের উৎপত্তি ঘটে তখন সে দেবতার প্রাণ্য পূজা দিয়ে রোগের চিকিৎসা চলে। সেজন্যে তেলপড়া জাতীয় ঔষধপত্রেরও ব্যবস্থা আছে। পূজা দিতে হয় সন্মাসরি রোগের উৎপত্তিস্থলে। সেখানে সংশ্লিষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে বিধিমতে একটি হাঁস কিংবা মোরগ অথবা মুরগী, যেটা তার প্রাণ্য, বলি দিয়ে সেই দেবতার সন্তুষ্টি বিধান করতে হয়। অনেক সময় শুধু একটা হাঁসের ডিম দিয়েও পূজা দেওয়া হয়ে থাকে। ডিমটা পূজাস্থানেই অঝা মন্ত্র পড়ে পুঁতে দিয়ে আসে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত ডিম খাওয়া রোগীর পক্ষে বারণ থাকে।

ভূত পূজা

খেলার সময় লাটিম হারায় বা ঘিলা হারায়, ছোট ছোট চাকমা ছেলেমেয়েরা সুর করে বলতে থাকে,—‘ভূদেই মা! দেষেই দে, দেষেই দে, বিজ্জুরাবুয়া কাবি দিম।’ (ভূতের মা, দেখিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও, বীজের মোরগটা কেটে ভোগ দেব।) সত্যি সত্যি জিনিষটা যখন খুঁজে পাওয়া যায় ছেলেরা তখন আর অবশ্য কিছু করেনা। কিন্তু বড়দের যখন গরু হারায়

কিংবা কোন বাচ্চা ছেলেকে 'কিছুতেই যখন খুঁজে পাওয়া যায়না, তখন ভূতের কাছে মোরগ মানত করে। তারপর যখন কোন অসম্ভব জায়গা থেকে সেই গরু কিংবা হারানো ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যায়, তখন মনে করা হয়, সত্যিই তাকে ভূত লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু মোরগ মানত করাতে ছেড়ে দিয়েছে। তখন অঝো ডেকে ভূতের উদ্দেশ্যে একটা মোরগ বলি দেওয়া হয়। কাউকে ভূতে পেলে তখনও মোরগ বলি দেওয়া হয়ে থাকে ভূতের সন্তুষ্টি বিধানের জন্তে। ভূত ছাড়ানোর জন্তে অবশ্য অঝাদের ঝাড়-ফুক তত্ত্বমস্ত্রও আছে। কোন কোন অসুখ বিন্ধের বেলায় চাকমা অঝা বৈঠোরা ভূতদের দায়ী করে এবং সেসব রোগের প্রারম্ভিক চিকিৎসা হিসাবে ভূতের জন্ত শূকর কিংবা মোরগ বলি দিয়ে থাকে।

ঠিক ছপূর বেলা কারো যদি রোজ গায়ে জ্বর আসে, তখন সেই ব্যক্তি রোগমুক্তির জন্য পাঁচপদ কি সাতরকম শাকপাতা সিদ্ধ করে চৌরাস্তার মাথায় নিয়ে ভূতের উদ্দেশ্যে সেগুলো মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এই বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে, - 'তোমার পাওনা তোমার সাধের শাকগুলো দিয়ে গেলাম। এবার আমাকে রেহাই দাও।' এর নাম 'খ কেলা'। এতেও নাকি অনেকে ভালো হয়ে যায়।

ভূতের পূজায় বলি দেওয়ারও কতকগুলো নির্দিষ্ট বিধি বিধান আছে। পালাজ্বর ছাড়ানোর জন্যে বড় শিয়াল্যা নামক ভূতের কাছে বলি দিতে হয়। নদীর ধারে এই বলি দেওয়া বিধি। 'সাবাগ কুরাহ' বলি দিতে হয় ভর সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর সিঁড়ির গোড়ায়। পূজার পর এই সব বলির মাংস রান্না করে ভূতের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার ভোগ নিবেদন করতে হয় ; তারপর খাওয়া যায়। 'দিবজ্যা গুগোর' বলি দেওয়ার বিধি চৌরাস্তার মাথায় ঠিক ছপূর বেলা। কোন ছারারোগ্য রোগীর রোগমুক্তি কামনায় যখন একরূপ শূকর বলি দেওয়া হয় তখন বিধিমতে পূজা দেওয়ার পর সেই বলির মাংস রান্না করে একখানা ডালার সাজিয়ে বাড়ীর উঠানে দ্বিতীয়বার ভূতের উদ্দেশ্যে নিবেদন

করতে হয়। ঐ সঙ্গে ডালাতে খই আর নানাপদের (রকম) শাকসবজিও দেওয়া হয়ে থাকে। বাড়ীর উঠানে এই ডালা সাজিয়ে অন্ন প্রদীপ ঝেলে মন্ত্র পড়ে তাৎ অশরীরীদের আহ্বান করতে থাকে—‘উত্তরখুন্ এক, দধিনখুন্ এক, পুগখুন্ এক, পকিমখুন্ এক, (ডালায় কাঠি দিয়ে এক এক আঘাত করে)—এক বারি দিলুং, একদিনঅ পধখুন্ এক; দি বারি দিলুং, দিধিনঅ পধখুন্ এক; তিন বারি দিলুং, তিন ধিনঅ পধখুন্ এক; চের বারি দিলুং, চের্ ধিনঅ পধখুন্ এক; পাচ বারি দিলুং, পাচ ধিনঅ পধখুন্ এক; ছ বারি দিলুং, ছ ধিনঅ পধখুন্ এক; সাত বারি দিলুং, সাতধিনঅ পধখুন্ এক। লেংঙারে আন কানাত্‌ওরি, কামোরে আন আহ্‌দত্‌ধুরি, ধুলোনত্‌ ওরা খেলে সিগুন্ আন ধুলোনত্‌ ওরি। আগারেখুন্ এক কাব্যাত্‌ ওরি, এৎ‌দখুন্ এক নত্‌ চরি—ইত্যাদি ইত্যাদি।’ ভূতদের উদ্দেশ্যে সে এক সার্বজনীন ভোজের দাওয়াত! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারদিকেরা ভুতেরা এস; একদিন হুঁদিন তিনদিন, চারদিন, পাঁচদিন, ছয় দিন, সাতদিনের দূরের রাস্তা থেকে এস। ল্যাংড়াকে আনো কাঁধে করে, কানাকে আনো হাতে ধরে। দোলনার শিশুদের আনো দোলনার করে। উজানবাসীরা এস তেলায় চড়ে, ভাটিদেশ থেকে এস নৌকায় চড়ে। যে গেমানে আভ, যে অবস্থায় আভ সবাই চলে এস, কেউ যেন বাদ না যায়। কেউ যদি বাদ পড়ে অঝার দোষ দিওনা। এভাবে নিবেদনের পর ডালাটা কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে পরে বাড়ীতে তুলে পূজার মাংস খাওয়া যায়।

ভূতদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো ‘চেলা’। এর প্রকাণ্ড শরীর, কিন্তু মস্তকহীন। ‘হুই বাহুমুলে আগুনের গোলকের মত এর হুঁটি চোখ। বর্ণনায় বোধ হয় হিন্দুদের কঙ্ককাটা বা কবন্ধ। এর নজর পড়লে আর রক্ষা নাই। তবে অনেক সময় শূকর বলি দিয়ে একে নাকি সন্তুষ্ট করা যায়। সেজন্তে কোন মরণাপন্ন রোগীর শেষ চিকিৎসা হিসাবে চেলার নামে শূকর বলি দিয়ে রোগীর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে অঝা একটি শূকর ছানা, কিছু খই, একটি তৈল

প্রদীপের উপকরণ ইত্যাদি নিয়ে একাকী জঙ্গলে পূজা দিতে যায়। গভীর জঙ্গলে পৌঁছে প্রথমে সে দীর্ঘ প্রলম্বিত স্বরে তিনবার ‘কু’ দেয়। সেই উৎকট শব্দ নির্জন অরণ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে স্বভাবতই তখন একটা ভৌতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। তারপর কোন এক গাছের গোড়ায় পূজার উপকরণ গুলো সাজিয়ে প্রদীপ ছেলে মন্ত্র পড়ে অঝো চেলাকে আহ্বান করে আর আগপাতা ফেলে শূকর ছানাটি তার উদ্দেশ্যে বলি দেয়। এই সময় নাকি নানারকম অস্বাভাবিক শব্দসাদা পাওয়া যায়। হয়ত বিনা বাতাসে কোথাও গাছের শাখা ঝোপঝাড় ইত্যাদি প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠে কিংবা মনে হয় কে যেন সারা বন তোলপাড় করে সবকিছু দলে পিষে এগিয়ে আসছে। তখন হয়তঃ বা শেঁা শেঁা শব্দে প্রবল বাতাস বইতে শুরু করল। সেই বাতাসে যদি পূজার প্রদীপটি নিভে না যায় তবে বৃষ্টি হবে রোগী এ যাত্রায় বেঁচে গেল। আর যদি নিভে যায় তখন আর কোন আশাই থাকেনা। খুব সাহসী না হলে এ পূজায় অঝাগিরি করা চলেনা। অঝা অবশ্য সাধামত মন্ত্রমন্ত্র পড়ে গায়ের রক কবচ বেঁধে নিয়ে যায়। তবু নাকি সময় সময় অঘটন ঘটে আর পরদিন অঝাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই পূজার মাংস বাড়ীতে তোলা নিষেধ। ভালয় ভালয় পূজা উৎসবে গেলে বাড়ীর বাইরে কোথাও এই মাংস রান্না করে খাওয়া চলে। এই পূজার মাংস করে দ্বিতীয়বার ভোগ নিবেদনের প্রয়োজন হয়।

শিজি

অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন সন্ধ্যার মুখে কচি ছেলে নিয়ে কোথাও বেরোতে গেলে মায়েরা সাধারণতঃ ছেলের কপালে কাঁদল কিংবা তেলকালি দিয়ে একটা টিপ দিয়ে দেন। চাকমা জননীরাও তাই করে থাকেন। চাকমা বিশ্বাসমতে ছেলের উপর অপদেবতার কুনজর নিবারণের উদ্দেশ্যেই

এটা করা হয়ে থাকে। এ অপদেবতার নাম 'শিজি'। অনেকে একে 'কাল্ম' ও বলে থাকে। মুখ্যতঃ বাচ্চা ছেলেদের উপরই এর কুনজর বেশী। সাধারণতঃ ভর সন্ধ্যাবেলায় নাকি এর উপদ্রব বাড়ে আর তাই পারতপক্ষে কেউ এ সময়টায় বাচ্চাদের ঘরের বার করেন না। অনেকে নিজেদের বাড়ন্ত ক্ষেতের মাঝখানে বাঁশের মাথায় চুন দিয়ে আঁকাবুঁকি করা কেলোহাড়ি বসিয়ে রাখে। এগুলো কিন্তু কাকতালুয়া নয়। এগুলো ঝুলানোর উদ্দেশ্যে হলো কুদৃষ্টি নিবারণ; তবে সেটা মানুষের। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত উভয় প্রক্রিয়াই উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই পরিচয় বহন করে।

শিজি অপদেবতার ভর হলে শিশু যাবপন নাই অস্থিরতা প্রকাশ করে। ভয় পাওয়ার মত কণে কণে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে উচ্চৈশ্বরে কঁাদতে থাকে। মায়ের দৃষ্ণও খেতে চায়না। যদি বা একবার মাই মুখে দিল তো পরক্ষণে হয়ত বিগুণ জোরে কান্না জুড়ে দেয়। তখন কিছুতেই আর তাকে শান্ত করা যায়না। এ সময় শিশুর গায়ে কিছুটা টেম্পরেচার (তাপমাত্রা, উষ্ণতা, উত্তাপ) থাকাও বিচিত্র নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এসব ক্ষেত্রে তাত্ক্ষণিকভাবে শিশুর কপালে কাঁচা হলুদের টিপ্ দিয়ে দেওয়া হয়। হাতে পায় এবং গলায় সরষের দানা পুঁটুলি করে বেঁধে দেওয়া হয়। মন্ত্রপড়া সারিয়া হলে কথা থাকেনা, তাতেই হয়ত শিশু আরাম হয়ে যায়। কিন্তু বাঁড়াবাড়ি রকমের হলে তখন শিজি অপদেবতার নামে একটি কালো মুংগীর ছানা উৎসর্গ করে তার সজ্জা বিধান করতে হয়। ঘরে উঠার সিঁড়ির মুখে এই পূজা অনুষ্ঠান সম্পাদন করা বিধি। ইলা বাহুল্য, অথবা বৈজ্ঞানিক পোরেহিত্যেই কেবল এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে।

চাকমা ভাষায় 'শিজি' অর্থ প্রকৃতপক্ষে শুচি এবং অশিজি অর্থ অশুচি। শিজি আসলে অশুচি দেবতা। চাকমায়া কাউকে লক্ষ্মীছাড়া বলতে অলক্ষ্মীছাড়া বলে থাকে। তেমনি কোন এক ফাঁকে বোধ হয় এখানে অশিজি দেবতা শিজি হয়ে গেছে।

ভাতত্যা

চাকমারা বৌদ্ধ এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে যে, যতদিন না কামনা বাসনার স্বয়ং হয় ততদিন প্রত্যেক মানুষকেই পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম নিতে হয়। অনেকে কৃতকর্ম দোষে মনুষ্যোত্তর হীনধোনীতে জন্মগ্রহণ করে, আবার অনেকে অতীতের মায়ী বন্ধন কাটিতে না পেয়ে নিজ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেই আবার জন্ম নিয়ে থাকে। এই সব মৃত আত্মীয় বর্গের সদগতি কামনায় তাদের বিগত দিনের অতৃপ্ত বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে চাকমারা এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। এর নাম ভাতত্যা অর্থাৎ ভাতদান বা পিণ্ডদান। নিজ গোষ্ঠীভুক্ত লোকের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ থাকে বলে এটাকে গোষ্ঠীভাতও বলে।

ভাতত্যা অনেকটা হিন্দুদের প্রেত তর্পনের মত। তবে এতে সমষ্টিগত ভাবে গোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাক মৃতব্যক্তির জগত্বে পিণ্ডদানের আয়োজন করা হয়ে থাকে আর তাই গোষ্ঠীভুক্ত সবার সক্রিয় সহযোগিতা এতে দরকার পড়ে। এর প্রস্তুতি পালা যেমন ব্যাপক তেমনি এই যজ্ঞানুষ্ঠান খুবই ব্যয়বহুল। একারণে ভাতত্যা এখন বিরল। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোন গোষ্ঠীতেই বোধ হয় এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। গোষ্ঠীর মধ্যে কতিপয় সজ্জতিপন্ন ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রথম উত্থোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। যখন গোষ্ঠীভাত দেওয়া হবে বলে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন প্রাথমিক পর্যায়ে গোষ্ঠীর উর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষ কিংবা সাত পুরুষের মধ্যে সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের বিজ্ঞক বা বংশ তালিকা নিখুঁত ভাবে তৈয়ার করা হয়। তারপর একটা সময় আর স্থান নির্বাচন করে কাছে কিংবা দূরে যেখানে যত সংগোষ্ঠীর লোক রয়েছে সবার কাছে আমন্ত্রণ লিপি পাঠানো হয়ে থাকে। যজ্ঞের স্থান ও একটা গোষ্ঠীর লোক ধরে মত প্রশস্ত হওয়া চাই। অনুষ্ঠান শেষে এই জায়গাটা কিন্তু শ্মশানের মতই পরিত্যক্ত হয়ে

পড়ে এবং চিরকালের জঘ ঘর বসতির অযোগ্য হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে গোষ্ঠীর লোক যে যেখানেই থাকুক এই নির্দিষ্ট জায়গায় এসে জড় হয়। সতোজাত শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ কেউই বাদ পড়েনা। এই জায়গায় আগে থেকেই লোকজনের অনুপাতে সবার জঘই সুবন্দোবস্ত করা থাকে। এখানে ভাগ্যরঘর রসুইঘর থেকে শুরু করে সারি সদর সাময়িক আস্তানা গড়ে তোলা হয় যাতে পূজার ২/১ দিন সবাই মাথা গুঁজে থাকতে পারে। পূজার স্থানটি তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। দোকান পাট বসে। এই সময় যত রকমের খাত্ত ভোজ্য জোগাড় করা সম্ভব সংগ্রহ করে ভাঁড়ারে জমা করা হয়ে থাকে। মহিষ, গরু, শূকর, ছাগল, মোরগ ইত্যাদিভে। অগ্নিভিত। তাছাড়া যুতদের চিতায় ধন্য পতাকা ওড়ানোর জন্তে রাশি রাশি খান কাপড়, খালা বাসন ঘটি বাটি থেকে যাবতীয় প্রকারের দান সামগ্রী ও যথেষ্ট সংখ্যায় কেনা হয়ে থাকে। তখন ভাগ্যরঘর যেন একটা ডিপার্ট-মেন্টাল ঠোয়ের রূপধারণ করে। এ সমস্ত কিছুতে কিন্তু গোষ্ঠীর সকল লোকের কম বেশী আর্থিক সহায়তা থাকে।

ভাতত্যা পূজা কেবলমাত্র পূর্বে বর্ণিত প্রাচীন বৌদ্ধ পুরোহিত রুদ্রদের পৌরহিত্যেই সম্পাদিত হয়। তাছাড়া একাজে আরো এক ধরনের একাধিক সাহায্যকারীও থাকে যাদের বলা হয় 'লুখাক'। এরা এই পূজার কৃত্যাকৃত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকে। বলা বাহুল্য, পূর্বে বর্ণিত অবাদের এই পূজার কোন ভূমিকা থাকেনা। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আঘর্-তারা ও রুদ্রদের মতই এখানে অপরিহার্য। এই পূজার আঘর্-তারা থেকে পর্যায়ক্রমে ষোলটি তারা আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। যথা :-সিগল মগল তারা অরিন্দ্ৰাম তারা, সাহল ফুলু তারা, অনিচ্চা তারা, সাদেংগী তারা, মালেম তারা, দশ পারমী তারা, পুহম্ ফুলু তারা, চেরাগ ফুলু তারা, রাখিম্ ফুলু তারা, পুতুম্ ফুলু তারা, সামি ফুলু, বুদ্ধ ফুলু, জ্যাকরণ, সুব.দিশা, ত্রিপুস্ত ইত্যাদি। যজ্ঞস্থানের চারধারে আগের তৈরী বংশ তালিকা মতে যুতদের প্রত্যেকের জন্তে এক একটা প্রতীক চিতা নির্মাণ করা হয়ে থাকে। সেগুলোতে

বংশদণ্ডের উপর 'তাংগোন্' অর্থাৎ খান কাপড়ের তৈরী সারি সারি ধ্বজা পতাকা ওড়ানো হয়ে থাকে। পূজার আগের দিন সন্ধ্যায় রুহি প্রতিটি প্রতীক চিত্রায় গিয়ে মন্ত্র পড়ে মৃত আত্মাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আসে। সে রাতে সবার জন্যে কাজের বিশেষ ভার। কেউ কেউ পাহাড়ায় থাকে কেউ কেউ রাজের মধ্যে মোষ, ছাগল, শূকর, মুরগী ইত্যাদি পশু পাখী বধ করে ভোরে ভোরে রান্না চাপিয়ে দেয়। কেউ কেউ ভোগ এর পর ভোগ ভাত রান্না আর কেউ কেউ মৃত রকমের সম্ভব তরকারী রান্নাতে বসে যায়। মোট কথা সেরাজে প্রায় লোকেরই অনিদ্রার কাটে।

পরদিন সকালবেলা রান্না হয়ে গেলে এক একটা *মেজান্* এর উপর কলাপাতা পেতে ভাত আর প্রত্যেকটা পদের তরকারী দিয়ে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এক একটা 'আদারাহু' অর্থাৎ পিণ্ডাধার সাজানো হয়ে থাকে। প্রত্যেকটাতে আবার পান সুপারী, চাকমাদের হরেক রকমের পিঠে এমনকি মদও দেওয়া হয়। এভাবে মৃতের সংখ্যা যদি পাঁচশত হয় তবে পাঁচশত আদারাহু সাজাতে হবে। তারপর সকলে মিলে এগুলোর এক একটাকে প্রত্যেকটা প্রতীক চিত্রায় বিধিমনে নিবেদন করে আসে। এই চিত্রাগুলোর সব সময় পাহাড়া বসানো থাকে যাতে কুকুর কিংবা অন্য কিছুতে মুখ দিয়ে আদারাহু এঁটো করতে না পারে। এই করতেই বেলা হয়ে যায়। তখন রুহি আঘরভারা আবৃত্তি করে এই মহাযজ্ঞের উদ্বোধন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সমাপ্তি ঘটে ততক্ষণ তাকে পর্যায়ক্রমে ঘোলাটি ভারা আবৃত্তি করে যেতে হয় বিরামহীনভাবে। এই সময়ে গোলা ফুটে, আকাশে হাউই হৌড়া হয় আর ঘোঁর হবে ঢোল বাজ বাজে।

তখন সে এক হৈ হৈ ব্যাপার শুরু হয়ে যায়। চারদিকে ছুটোছুটি আর হৈ চৈ এর মধ্যে হঠাৎ করে এক একজন লোক সম্মোহিতের মত মাটিতে

মুটিয়ে পড়ে আর কীণ নাকি সুরে কাঁদতে থাকে। এমনি ভাবে মেয়ে পুরুষ ছেলে বড়ো সব পদের লোকই আবিষ্ট হতে পারে। এক সঙ্গে চার পাঁচ জনেরও একই অবস্থা ঘটতে পারে। সবারই একই ধরনের আবেশ হয়ে থাকে। স্বপ্নাবিষ্টের মত সবারই বিহ্বল ভাব, সবারই ছুঁচোখ বোঁজা। তখন বিজ্ঞক্ অর্থাৎ মৃতদের বংশতালিকা হাতে লোক ছুটে যায় তাদের কাছে আর তুমি কি অমুক এসেছ, সমুক এসেছ ইত্যাদি বলে মৃত আত্মীয়দের নাম ধরে তাদের জিজ্ঞেস করতে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ না তার পূর্বজন্মের নাম এসে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সে শুধু নাকি সুরে ইনিয়ৈ বিনিয়ৈ কাঁদতেই থাকে। আর যখন তালিকাটা তার পূর্ব জন্মের সঠিক নামে এসে ঠেকে তখন হঠাৎ লোকটার কারা খেমে যায় এবং চোখ বোঁজা অবস্থাতেই ইন্ধিতে স্বীকার করে, হ্যাঁ, তার নাম ভাই ভিল বটে। তখন তাকে ফের জিজ্ঞেস করা হয়, তার ইচ্ছে কি? কি পেলে সে ভালো হয়ে যাবে। তারপর যেন বহু দূরগত শব্দের মত অতি কীণস্বরে তার উত্তর ভেসে আসে। কেউ হয়তঃ বলে, গত জন্মে আমার অমুক জিনিষটা খেতে সাধ হয়েছিল কিন্তু আমার ছেলে কিনে দেয়নি। সেই ছুঁখ নিয়েই আমাকে মরতে হয়েছে। তখন খোঁজ খোঁজ সব পড়ে যায় সে জিনিষটার জন্তে। তার আগের জন্মের ছেলে তখনও যদি বেঁচে থাকে, তার কাছে হয়তঃ জানা যাবে সত্যি সে টাকার অভাবে তার বাবাকে সে বিশেষ জিনিষটা খেতে দিতে পারেনি। তখন যেখান থেকে হোক, যত মূল্যেই হোক সে জিনিষটা কিনে এনে আদারাহুতে নিবেদন করে দিতে হবে যেটা তার জন্তে নির্দিষ্ট করা থাকে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে একজন্তে সম্ভাব্য অসংখ্য পদের দান সামগ্রী পূর্বাঙ্কেই ভাতার ঘরে প্রচুর পরিমাণে এনে জমা রাখা হয়ে থাকে। এদিকে তৎক্ষণাৎ লোকটার মোহাবেশ কেটে যায় আর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে গেয়ে উঠে দাঁড়ায়। কারো কারো দাবী খুব সামান্যই থাকে। হয়তঃ একটা চাকমা পিঠা কিংবা কোন এক পদের তরকারি। কারো কারো আবার থালা ঘটি, বাটি এমনকি, গরু মোষের বায়নাও থাকে। কোন বাচ্চা মেয়ে আবার

এ সময় ভাবগ্ৰস্ত হয়ে বলতে শুনা গেছে, আমার গন্ত জন্মের স্বামী আবার গড়িয়ে দেবে বলে আমার অমুক পদের গয়না নিয়ে বেচে দেয়, কিন্তু সে আর দেয়নি। সেই ছ'খ আমার বুকে কঁটার মত বিঁধে আছে। মেয়েটি হয়তঃ জন্মেও তার গন্ত জন্মের স্বামী লোকটাকে দেখেনি। কিন্তু তার কাছে জানা যাবে, সত্যিই সে তার জীব জীবিত কালে ঐ পদের গয়না নিয়ে অর্থাভাবে গড়িয়ে দিতে পারেনি। মেয়েটি সে জন্মে তার কি নাম, তার কত ছেলেমেয়ে ছিল, কোন বছর তারা কোথায় কোথায় জন্ম করেছে ইত্যাদি বিষয়ও ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে। তখন তাকে সেই পদের গয়না কিংবা তার বাজারজাত মূল্য অবগতই ধরে দিতে হবে। এই অবস্থায় যদি কোন ইঙ্গিত বস্তু ছল'ভ হয়ে পড়ে এবং কিছুতেই তা' পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনা, তবে সংশ্লিষ্ট মেয়ে বা পুরুষ সে অবস্থার মৃত্যুবরণ করে অথবা জন্মের মতই পাগল হয়ে যায়। এমনও জানা যায়, ভাতভাত্য রুগি কর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্রের শ্রুতি সীমার মধ্যে অনেক সময় গরু, ছাগল, শূকর ইত্যাদিও এভাবে হঠাৎ আনিষ্ট হয়ে পড়ে। বুঝতে কষ্ট হয়না যে, এরা কর্মদোষে মনুষ্যোত্তর জন্ম লাভ করেছে। এই পশুযোনি থেকে এদের মুক্তির জন্য কোন কিছু করা সম্ভব নয় বলে এরা সে অবস্থাতেই প্রাণ-ত্যাগ করে।

দিনের শেষে কিংবা যখনই খুব বেশী সংখ্যায় লোক ভাতভাত্য মোহগ্রস্ত হয়ে পড়তে শুরু করে তখন অবস্থা পর্যালোচনা করে পূর্বোক্ত রুগির সহকারী লুখাক্ বাকী আদারাহগুলো থেকে কিছু কিছু খেয়ে সেগুলো এঁটো করে দেয়। তখন লোক আবিষ্ট হয়ে আবিষ্ট হয়ে পড়লে তাদের পড়া বন্ধ হয়ে যায়। একসঙ্গে বেশী লোক সামলানো এবং যথোচিত খোঁজ খবর করা সম্ভব হয়না, তাই রুগিও সেখানেই মস্তোচ্চারনে ইতি টানে।

ভাতভাত্য প্রত্যক্ষ করেছেন কিংবা নিজে ভাতভাত্য আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন এমন লোক সমাজে খুব বিরল। যারা আবিষ্ট হয় তখন সে অবস্থায় তারা যা করে কিংবা যা' কিছু বলে, জ্ঞান ফিরে আসার পর তাদের নাকি

সে সব কিছুই মনে থাকেনা। শুধু স্বপ্নের মত একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ভেগে থাকে, যা ভাবায় প্রকাশ করা যায়না। হয়তঃ সাময়িক কালের জন্ত সে সব লোক আত্মস্মরণ হয়ে যায়।

বৌদ্ধ জাতকমালায় প্রথম খণ্ডে মতকভক্ত জাতক নামে একটা কাহিনী আছে। এতে দেখা যায়, বুদ্ধের সময়ে এমনকি বুদ্ধের জন্মেরও বহু পূর্ব থেকে ভারতে পশু পাখী বধ করে মৃতদেবের উদ্দেশ্যে ভাতদান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা চাকমাদের ভাতত্যা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এদা দাগা

বাংলার একটা কথা আছে, ‘ভরে আশ্রাম খাঁচা ছাড়া’। চাকমাদের মধ্যে এই কথাটার একটা অদ্ভুত বাস্তব নজীর রয়েছে। একেত্রে কিন্তু আশ্রামকে আবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় খাঁচার কিরিয়ে আনা যায়। এটাকে ভাততয়ার একটা কুম্ভাভিযুক্ত সংস্করণ বলা চলে। হাঁটি হাঁটি পা পা এই বরষের বাচ্চা ছেলেমেয়ে হঠাৎ যদি খুব ভয় পায়, অনেক ক্ষেত্রে সে ভরে একেবারে মেতিয়ে পড়ে। ছেলেটার বাবা মা, যাদের সে খুব ভাতটী অনেক সময় তাদেরই কেউ রাগের বশে ছেলের উপর তর্জন গর্জন করে এরূপ বিপত্তি ঘটরে থাকে। তখন বাচ্চাটা বাড় সোজা রাখতে পারেনা। চোখ বোঁজা অবস্থায় ভাততয়ায় আবিষ্ট হয়ে পড়া লোকের মত একঘেঁয়ে ভাবে কাঁদতে থাকে আর অল্পেতে নিউরে উঠে। এসময় হয়তঃ গা সামান্য গরমও হ’য়ে থাকতে পারে। সহসা এর উপশম ঘটতে না পারলে ছেলের প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। এ অবস্থাকে বলে ‘এদা জুরানা’ অর্থাৎ দিনা আশ্রাম খাঁচা ছাড়া হওয়া।

যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এরূপ ছেলেকে স্বাভাবিক অবস্থায় কিরিয়ে আনা যায়, তাকে বলে ‘এদা দাগা’ এই অনুষ্ঠানে কোন দেবতার পূজা হয়না এবং বিশেষ কোন মন্ত্রোচ্চারণেরও কোম বালাই নাই। অবা বা যে কোন

অভিজ্ঞ লোক এব্যাপারে পৌরহিত্য করতে পারে। এ সমুষ্ঠানেও ভাতগার মত 'মেজাং' এর উপর আগ্ কল্যাপাত। পেতে আদারাহু সাজাতে হয়। তবে সেখানে ভাত তরকারী ইত্যাদি কিছুই দিতে হয়না। উপকরণের মধ্যে লাগে কলা, আখ, আখের গুড়, ছ'রেকখানা 'বেঙ'পিঠা' আর একটি টাকা। আগের দিনে রূপোর টাকা দেওয়া হত। একাধিক দিলেও ক্ষতি নাই। অনুষ্ঠান শেষে এগুলোতে সূতা জড়িয়ে কিংবা গোটি লাগিয়ে ছেলে কিংবা মেয়ে তাকেই পরতে দেওয়া হয়। আদারাহুতে আর একটা সিদ্ধ করা মুরগীর বাচ্চাও দিতে হয়। যার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নরূপ —

মুরগীর বাচ্চাটাকে জবাই করে সেটার পালক ছাড়িয়ে নাড়িছ'ড়ি ফেলে মাথাটাকে ঘুরিয়ে এনে কণ্ঠার ছিদ্র দিয়ে পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেটাকে সেভাবে সিদ্ধ করে গোটাটাই আদারাহুতে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সময় ছেলের মা বাচ্চা কোলে বাড়ীর সদর দরজায় বসে থাকে আর নীচে মাটিতে অঝা আদারাহু বসায়। আদারাহু বসানো মেজাং এর সঙ্গে সাতগাছি সূতো বেঁধে তার অপর প্রান্ত ছেলের মা হাতে ধরে থাকে। আদারাহু যার জন্তে সে যদি ছেলে হয় তবে একখানা গামছা দিয়ে আর মেয়ে হলে একখানা 'খবং' কিংবা খাদি দিয়ে আদারাহুটা ঢেকে দিতে হয়। সব কিছু ঠিক ঠাক হয়ে গেলে অঝা আদারাহু ঢাকনা ঈষৎ ফাঁক করে এদা ভাকে,—পাতুক-তুক, ত বাবে কেচ্কেজ্যেয়ো, তন্মা কেচ্কেজ্যেয়ো ইত্যাদি ইত্যাদি। যার ভাবার্থ হলো, তোকে বাপ, শাসিয়েছে, মা খেদিয়েছে, এখন তারা তোকে কলা দিয়েছে, আখ দিয়েছে, আয়! আয়! তোর জিনিষ তুই বুঝে নে। অঝা একখানা গামছা দিয়ে ডাকার মত করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এভাবে ডাকে যতক্ষণ না একটা মাছি এসে আদারাহুতে বসে। মাছি বসলে তখন আদারাহু তুলে নিয়ে ছেলেকে গছানো হয় অর্থাৎ তার সামনে ধরা হয়ে থাকে। সে সেখান থেকে যা' খুণী একটা কিছু হাতে তুলে নেয়। তারপর ভালো হয়ে যায়।

বৃহচ্চক্র

ব্রিটিশ আমল থেকে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিনে রাজ্যমাটিতে একটা উৎসব মহা সমারোহে উদযাপিত হয়ে আসছে। এর নাম বৃহচ্চক্র মেলা। এখন স্থানীয় আনন্দ বিহার প্রাক্তনে এই মেলা বসলেও তখনকার দিনে রাজ্যমাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়েই এই উৎসবের অনুষ্ঠান করা হত। বৃহচ্চক্র রচনা করা হত স্কুলের লাগোয়া উত্তর পূর্ব কোণের জমিটাতে। এ জায়গাটা তখন খালি ছিল। স্কুলের পাহাড়ী বৌদ্ধ ছাত্রেরা ছিল এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। হিন্দু ছাত্রদের যেমন সরস্বতী পূজা পাহাড়ী ছাত্রদের জ্ঞান ও তখন মাঘী পূর্ণিমার এই অনুষ্ঠান ছিল অবশ্য করণীয়। প্রতি বৎসর যারা অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে প্রমোশন পায় তাদেরই এ উৎসবে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হত। ওরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাঁদা তুলত, জঙ্গল থেকে নিজেরাই বাঁশ কেটে এনে বৃহচ্চক্র তৈরী করত। রাজ্যমাটি জেলখানার পর থেকে উত্তরে রিজার্ভ বাজার এরিয়া পর্য্যন্ত এই এলাকাটা তখন ছিল সরকারের সংরক্ষিত গভীর বন। মাঘী পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে বৃহচ্চক্র তৈরীর জ্ঞান এখান থেকে প্রয়োজনমত বিনা শুধু বাঁশ আহরণের জ্ঞান বনবিভাগের অনুমতি পাওয়া যেত। পূর্ণিমার আগের দিনই বৃহচ্চক্র নির্মাণ শেষ হয়ে যায় আর তার পরদিনই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সর্ব সাধারণের প্রবেশের জ্ঞান খুলে দেওয়া হয়। বৃহচ্চক্রের কেন্দ্রস্থলে থাকে বুদ্ধমূর্ত্তি। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে নানা গোলকধাঁধা পেরিয়ে এখানে পৌঁছে বুদ্ধ পূজা করার মধ্যে একজনের বৃহচ্চক্র পরিভ্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটে। এটা অনেকটা গোলকধাম খেলার মত। মাঝে মাঝেই এখানে আসলে পুনঃ সংসারে পতনের মত অবস্থা প্রায় লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তখন হাসাহাসির ধুম পড়ে যায়। এই বৃহচ্চক্র মেলায় তখনকার দিনেও বেশ লোক সমাগম হত। অনেকে মজা করে বৃহচ্চক্র মধ্যে ঘুরতে আসতেন। এখানে কিন্তু জুতা পায়ের প্রবেশ নিষেধ। ছেলেরা অভ্যাগতদের লুচি আর মিষ্টান্ন দিয়ে

আপ্যায়ন করত। নিজেদের মধ্যে চলত দৈ খাওয়ার মহোৎসব। তখন অবশ্য এখনকার মত চায়ের চল ছিলনা।

সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা। এর জন্তে বৃহচ্চক্রের প্রতি বেড়ার মাথায় এক একখানা বাঁশের ফালি লাগানো থাকে যার খাঁজযুক্ত অংশটা থাকে উপরমুখো হয়ে। পূণ্যার্থী নর নারীরা কেন্দ্রস্থলে বুদ্ধমূর্তির সামনে এবং এ সমস্ত বাঁশের ফালিতে সারি সারি মোমের বাতি জ্বালিয়ে দেয়। তখন সমস্ত পূজা মণ্ডপ অপূর্ব আলোক মালায় ঝলমল করে উঠে। এদিকে তখন একটার পর একটা ফানুস ওড়ানো শুরু হয়ে যায়। এমনভাবে সারাদিনের উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৩৪ ইংরেজীতে স্থানীয় আনন্দ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে আনন্দবিহার পরিচালনা কমিটি এই বৃহচ্চক্র মেলা উদযাপনের ভার গ্রহণ করেন আর তখন থেকে আনন্দবিহার প্রাঙ্গণেই এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে আসছে। এখন একটা কথা বলা প্রয়োজন যে এই বৃহচ্চক্র কিন্তু হিন্দুদের অভিমত্যা বধের চক্রবৃহৎ নয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রতীত্য সমুৎপাদ বলে একটা অধ্যায় আছে। এই প্রতীত্য সমুৎপাদ “দ্বাদশাঙ্গে” বিভক্ত*। মানুষ তথা সমস্ত জীব জগত কিভাবে এবং কিসের আকর্ষণে পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং মৃত্যুর পথে ধাবমান ভগবান বুদ্ধ তা দ্বাদশভাগে ভাগ করে পুণ্যানুপুণ্যরূপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে। এক কথায় এই হচ্ছে ভবচক্র এবং এই চক্র অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মাপন চেষ্টার বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার নামই নির্বাণ।

* অবিজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়ত্তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরামরণ ইত্যাদি।

বিবু

ফী বছর চৈত্রমাস আসতেই এ অঞ্চলে একটা পাখী এসে ডাকে,—
বিবু ! বিবু !! বিবু !!! চাকমারা এক বলে বিবু পেইক বা বিবু পাখী ।
সম্বৎসরে বিবু চাকমাদের সবচেয়ে বড় পরব । মুসলমানদের যেমন ঈদ,
হিন্দুদের যেমন দুর্গাপূজা, চাকমাদের তেমনি বিবু উৎসব । চৈত্রের শেষ
তিনদিন আর পহেলা বৈশাখ নিয়ে তিনদিন চাকমারা মহাসমারোহে বিবু
পরব উদযাপন করে । প্রত্যেক বছর পাখীটা এসে যেন আগে ভাগে
লেই বিবুর আগমনী জানান দিয়ে যায় । তখন ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে যায়
আর তখন থেকে প্রতি ঘরে ঘরে নীরবে বিবু পরবের জন্য প্রস্তুতি চলে ।
পর্যায়ক্রমে যে তিনদিন ঘরে বিবু উৎসব চলে, চাকমারা তাকে বলে
যথাক্রমে ফুল বিবু, মূল বিবু, এবং গোজোই পোজ্যা দিন । এই তিনদিন
চাকমারা কোন প্রাণীহত্যা করেনা । কাজেই তার আগের দিনেই যা' কিছু
মুখরোচক খাবার দাবার পরবে, অন্যে সংগ্রহ করে রাখতে হয় । তা'ছাড়া
মূল বিবু দিনের জন্য পানীর মদ জগরাহুতো পূর্বাংহেই ঘরে ঘরে দেদার
পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে ।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, বিবু উৎসব কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে কোন বৌদ্ধ পর্ব নয় । বৌদ্ধ সাহিত্যে কোথাও বিবু পরবের
উল্লেখ পাওয়া যায়না । সেই আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধের সময়ে
বাংলা সন চালুই ছিলনা । এটা বোধহয় অনেক পরবর্তী কালের বাংলার
একটা সার্বজনীন মহোৎসব । বাঙ্গালী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে চাকমারা এতে
কিছুটা ধর্মীয় আলপনা দিয়ে নিজেদের মত্ত করে এটাকে আপন করে
নিয়েছে । আর কালে কালে এটাই এখন তাদের মুখ্য পরবের রূপ নিয়েছে ।
মারমাদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য । এই পরবকে চাকমারা বলে
বিবু আর মারমারা বলে সাংগ্রাই । ছোটোই বাংলার অপভ্রংশ । বিবু অর্থ
হলো বিবু সংক্রান্তি আর সাংগ্রাই যে সংক্রান্তি সে তো বগাই যায় ।

ফুল বিবু

চৈত্র শেষের আগের দিন ফুল বিবু উৎসব। এই দিনে পাড়ার সবাই খুব ভোরে উঠে বাড়ীর অঙ্গন প্রাঙ্গন ঝাঁটপাট দিয়ে বাকবাক তকতকে করে রাখে, তারপর গাঁয়ের পাখবতী নদী বা ছড়াতে গিয়ে স্নান করে আসে। ছেলে পিলেরা হরেক রকমের ফুল তুলে এনে ঘরদোর সাজায়। এই সময় এক রকমের বুনো ফুল ফুটে। চাকমায়া এ ফুলকে বলে বিবু ফুল। এ ফুলকে আবার ভাতজরা ফুলও বলা হয়ে থাকে। অনেকে নদীর ঘাটে গঙা অর্থাৎ জলদেবীর উদ্দেশ্যে ফুল দিয়ে আসে। কেউ কেউ ঘিলা, কজ্জই আর সোনা রূপার পানি ছিটিয়ে ঘর পরিশুদ্ধ করে। ধারে কাছে বৌদ্ধ বিহার থাকলে দলে দলে বিহারে গিয়ে বুদ্ধ বন্দনা, ফুল পূজা, প্রদীপ পূজা করে। ভিক্ষু বন্দনা করে ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরৎসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করে। ফুল বিবুর দিন বিহারে বিহারে সমবেতভাবে বিহারের বুদ্ধমূর্তিগুলো স্নান করানো হয়ে থাকে। এইদিন এবং উৎসবের বাকী দুইদিন দৈনন্দিন কাজকর্ম বন্ধই থাকে। ছেলেপিলেরা ছোট ছোট টুকরিভে ধান নিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে হাঁস মুরগীদের খেতে দেয়। অনেক যুবক যুবতী এই দিনে এবং মূল বিবুর দিন কলসী কলসী জল তুলে পাড়ার বুড়ো বুড়ীদের গোসল করিয়ে তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। এভাবেই হাসি গল্পের মধ্যে দিনটা যায়। এইদিনে মদ খাওয়া হয়না। সাঁঝের বেলায় সবাই আবার বিহারে যায়। কেউ কেউ জলের ঘাটে, দোর গোড়ায় এমনকি গোশালার পর্যন্ত সারি সারি প্রদীপ জালিয়ে দেয়। সারা গ্রাম তখন আলোক মালায় বলমল করে উঠে।

মূলবিবু

বছরের শেষ দিন মূল বিবু উৎসব। বিবু পরবের মূল উৎসব এই দিনেই হয়। এই দিন খুব ভোবে সবার ঘরে ঘরে পাজন্ রান্না করা হয়ে থাকে।

পাজন্ অনেকটা ঘণ্টের মত। কমপক্ষে পাঁচ পদের মিশ্রিত আনাহুপাতি দিয়ে রান্না করা হয় বলে একে পাজন্ বলে। অর্থাৎ কিনা পাঁচ মিশালী। কার ঘরের পাজন্ বেশী মুখরোচক হতে পারে তাই নিয়ে ঘরে ঘরে তখন একটা নীরব প্রতিযোগিতা চলে। পাজন্ ছাড়া বিবু উপলক্ষে রকমারি খাবার দাবারও প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বিিন্নি ধানের ঝৈ, তিলের নাড়ু, হরেক রকমের চাকমা পিঠে এবং সিদ্ধ করা মিষ্টি আলু ইত্যাদি প্রায় সবার ঘরে ঘরে বিবুর দিনে খেতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ এখন বাঙ্গালীদের ধরণে সেমাই, পায়ের ইত্যাদিও তৈয়ার করে থাকে।

মূলবিবুর দিন সকাল থেকেই ঘরে ঘরে খাওয়ার পালা চলে। এইদিন সবার জুড়ে অব্যাহত ঝার। সকাল থেকে সবাই দলে দলে বার হয়ে পড়ে আর সারাদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে পাজন্ থেকে শুরু করে বিবিধ খাবার খেয়ে বেড়ায়। ভাছাড়া মদ, জগরাহু অর্থাৎ বিিন্নিধানের অপরিষ্কৃত মিষ্টি মদ ইত্যাদিভো প্রীতি ঘরেই অপরিহার্য। এভাবে খেতে খেতে অনেকে পাড়া ছাড়িয়ে ভিন্ন পাড়ায় চলে যায়। এদিন আর প্রায় কারোরই বাড়ীতে খাওয়া হয়না। মূল বিবুর দিন এত অজস্র খানাপিনা চলে যে এই নিয়ে চাকমাদের মধ্যে একটি বাগ্‌ধারাই চালু হয়ে গেছে। কারো কোন সময় মেলা খানা জুটে গেলে সবাই তখন বলে,—‘তা মুঅন্ত্ ইচ্যা বিবু পোঝো’—অর্থাৎ কিনা আজ বিবুদিনের মত অটেল খানা তার মুখে এসে উঠে করেছে।

পাড়ায় উঠতি বয়সের মেয়ে থাকলে এই বিবুর দিনে প্রথম বারের মত তাদের খাদি অর্থাৎ কাঁচুলীর মত বুকের কাপড় পরতে দেওয়া হয় আর তখন থেকে ওরা পূর্ণ যুবতীর মর্যাদা লাভ করে থাকে। অপরাহ্নে পাড়ার মাঝখানে ছায়াবহুল বটগাছের নীচে গাবুজ্যা গাবুরী অর্থাৎ যুবক যুবতীদের খেলার আসর জমে। ঘিলাখারা, পোত্তিখারা ইত্যাদি খেলার পাড়ার যুবতীদেরও অংশ থাকে। অনেক সময় উভয় দলের মধ্যে

প্রতিযোগিতাও চলে। আগেকার দিনে যুবক যুবতীদের বিবুর সময় দলবেঁধে সমভুলের পাহাড়তলী মহামুনি, রাজানগর ইত্যাদি জায়গায় বৃক্ষমেলার যেতে দেখা যেত। চাকমা পাহাড়তলী মহামুনি মেলাকে বড় কদলপুর এবং রাজানগর বৃক্ষ মেলাকে চিগোন অর্থাৎ ছোট কদলপুর বলে। এখনও এসব জায়গায় কী বছর চৈত্র সংক্রান্তির সময় বিরাট বৃক্ষমেলা বসে এবং বেশ কিছুদিন স্থায়ীও হয়। কিন্তু নানাবিধ কারণে এখন আর সেসব জায়গায় পাহাড়ীদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়না। বস্তুতঃ এসব জায়গায় বিরাট বিরাট বৃক্ষ মূর্তিগুলো দূর অতীতে উপজাতীয় রাজ রাজড়ারাই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

গোজ্যেই পোজ্যা দিন

পহেলা বৈশাখ গোজ্যেই পোজ্যা দিন। এদিন বিবু উৎসবের শেষ দিন। গোজ্যেই পোজ্যা দিনের অর্থ গড়াগড়ি যাওয়ার দিন। আগের দিনের যথেষ্ট মাতামাতি, হৈ ছন্দোড় আর অব্যাহত খানাপিনার সকল সামলাতে পরের দিন গড়াগড়ি খাওয়ারই কথা। তবে এর বিপরীতেও একটা কথা আছে। দুই অতীতে মূল বিবুর দিনে নাকি খাওয়া দাওয়ার পাট ছিলনা। এইদিন সবাই ধর্ম কর্মে রত থাকতো। মদ ভাং খাওয়া চলত না। বছরের শেষ দিনটাকে সবাই বৃক্ষপূজা, ভিক্ষু সেবা, ধর্মকথা শোনা ইত্যাদি ধর্মোচরণের মধ্য দিয়ে বিদায় দিত। আর পহেলা বৈশাখ এমন পান ভোজনের স্রোত বয়ে যেত যে দিনের শেষে সবাইকে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে হত। এ জন্যেই নাকি এ দিনের নাম হয়েছে গোজ্যেই পোজ্যা দিন।

এখন গোজ্যেই পোজ্যা দিন বলতে গেলে বিশ্বাসের দিন হিসেবেই উদ্ঘাষিত হয়ে থাকে। এই দিন আবার মুসলিম শব্দ ঈদ এর মত কোলা-

ফুলির দিনও বটে। ছোটরা বড়দের বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রণাম করে তাদের আশীর্বাদ নেয়। অনেকে সামান্যাত্মসারে পাড়ার বড়ো বড়ীদের কাউকে ডেকে এনে সযত্নে ছোটো ভালমন্ড খাওয়ায়। অনেক ধর্মপ্রাণ নরনারী আবার উৎসবের তিনদিন বিহারে গিয়ে সকাল সন্ধ্যা ধর্ম কৰ্মে রত থাকে। বিবুর সময় প্রায় বিহারেই অপরাহ্নে ধর্মসভা বসে। ঐ সময়ে বর্ণাভ্যাসকে সজ্জিত ধর্ম পিপাসু নর নারীর ভিড় জমে। এভাবেই সমারোহের ভিতর দিয়ে চাকমাদের বিবু পরবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কঠিন চীঘর দান

বিগত ১৯৭৩ ইংরেজী থেকে চাকমারা প্রতি বৎসর কান্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে একটা মহাদান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে আসছে, যার নাম কঠিন চীঘর দান। চব্বিশ ঘটা সময়ের মধ্যে সূতা কেটে, রং করে, কাপড় বুনে, চীঘর সেলাই করে মহাদানক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির,-যিনি বনভাস্তে নামে সমধিক পরিচিত, তাঁকে এই মহাদান দেওয়া হয়ে থাকে। কিকিঙ্গধিক আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বুদ্ধ শিষ্যা মহোপাসিকা বিশাখা সর্ব প্রথম এই মহাদান যজ্ঞের প্রবর্তন করেন। বর্তমানে বৌদ্ধ জগতে আর কোথাও এই প্রকার মহাদান দেওয়া হয় বলে জানা যায়না।

কঠিন চীঘর দানের প্রথা উৎপত্তি সম্পর্কে বৌদ্ধ সাহিত্যে এইরূপ একটা বিবরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধ এক সময়ে শ্রাবস্তীতে অবস্থান কালে ৩০ জন পাবন্যাসী ভিক্ষু বর্ধাবাস শেষে বুদ্ধ দর্শনের জন্তে শ্রাবস্তীতে আগমন করেন। দীর্ঘ তিনমাস কাল একটানা ব্যবহারের ফলে ভিক্ষুদের চীঘর তখন জীর্ণ এবং প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। কথিত আছে মহোপাসিকা বিশাখার একজন পরিচারিকা আহ্বারের জন্তে এই ভিক্ষুদের আহ্বান করতে বিহারে গেলে তাঁদের নগ্নগাত্রে স্নানরত দেখতে পায়। এই বিষয় মহোপা-

সিকাকে অবগত করানো হলে তিনি স্বয়ং বৃদ্ধের কাছে গিয়ে ভিক্ষুদের পরিষের বস্ত্রের শোচনীয় জীর্ণদশার কথা জানতে পারেন। তখন তিনি বৃদ্ধের আদেশ, উপদেশ নিয়ে এক অহোরাত্রের মধ্যে বিপুল অর্থব্যয়ে যথেষ্ট সংখ্যক চীবর প্রস্তুত করে নিয়ে পরদিন অরুণোদয়ের পূর্বেই ভিক্ষুদের কঠিন চীবর দান করেন। বস্তুতঃ ভিক্ষুদের চীবরের অভূতপূর্ব দৈশদশাই বোধ হয় ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব স্বরাস্তিত করতে মহোপাসিকাকে অনুপ্রাণিত করে তোলে। অতঃপর এই থেকে প্রতি বৎসর ভিক্ষুদের বর্ষাবাস সমাপ্তির পরবর্ত্তী একমাস অর্থাৎ আশ্বিনী পূর্ণিমার পরদিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিহারে বিহারে বর্ষাবাস সমাপনকারী ভিক্ষুদের কঠিন চীবর দান করার প্রথা চালু হয়ে পড়ে। জগতে যত প্রকার ঐহিক দান আছে, বৃদ্ধ দেশনামতে কঠিন চীবর দান তাদের মধ্যে মহোত্তম এবং মহৎফল প্রদায়ী। কিন্তু বর্ত্তমান বৌদ্ধ জগতের সর্বত্র পূর্বে প্রস্তুত চীবর দিয়েই এখন এই দানকার্য্য সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

বনভন্তের মত বিদর্শনাচারী একজন আদর্শ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাক্ষাৎ লাভ করে চাকমাদের মনে মহোপাসিকা বিলাখার প্রবর্ত্তিত বিধিমতে তাঁকে কঠিন চীবর দান দেওয়ার অনুপ্রেরণা জাগে। কিন্তু একক প্রচেষ্টায় এই মহাদান যজ্ঞ সম্পাদন করার অসুবিধা দেখে বহু ধর্মপ্রাণ চাকমা নরনারী তখন একত্র হয়ে সমবেতভাবে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৭৩ ইংরেজীর ৬ই নভেম্বর তারিখে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রথম বারের মত চাকমা বনভন্তকে কঠিন চীবর দানে সক্ষম হন। প্রকৃত ভাবে তখন তিনটিলা বনবিহারে অবস্থান করছেন। এই প্রথম মহাদান কার্য্যে সূতা কাটার জন্ত ১৬টি চরকা এবং বয়নের জন্ত ৩৩ খানা বেইন অর্থাৎ কোমর তাঁত সংগৃহীত হয়। কাজের বিভিন্ন স্তরে কাজ করার জন্ত দুই শতাধিক পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাকর্ম্মী এতে অংশ গ্রহণ করেন। অবশ্য সমগ্র কর্ম্মকাণ্ডে মহিলা কর্ম্মীদের ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক। এ বিষয়ে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকা সবার

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে চাকমা মহিলারা একে একে প্রায় সবাই বয়নশিল্পে বিশেষ পারদর্শিনী আর তাতেই প্রতি বছর এ রকম একটা মহাদান যজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠে।

কঠিন চীঘর দানের জন্ত নির্ধারিত তারিখের আগের দিন নির্দিষ্ট সময়ে চরকা কাটা দিয়ে এই পুণ্য কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক বৎসর এই অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক চরকা এবং সম সংখ্যক বেইন এসে যায়। পুণ্যকামী ধর্মপ্রাণ নরনারীরা নিজেরাই এগুলো নিয়ে আসেন এবং তা দিয়ে নিজেরা কাজ করে পুণ্যকাজে সরিক হন। কিছু সূতা জমে গেলে তখন থেকে দ্বিতীয় কর্মিদলের কাজ শুরু হয়ে যায়। সূতা লাঙা, মাড় দেওয়া, তানা ইত্যাদি এই দলের কাজ। এই দলে কিছুটা অগ্রগতি হলে তখন তৃতীয় কর্মিদল সূতা রং করা কাজে লেগে যায়। কার্যোপযোগী কিছু সূতা রং করা হয়ে গেলে তখন থেকে তাঁতের কাজ শুরু হয়ে যায় আর এভাবে সারারাত একটানা পর্যায়ক্রমিক কাজ চলে। ভোরে ভোরে প্রায় তাঁতের কাজই শেষ হয়ে আসে। তখন থেকে ফের অপর দল চীঘর সেলাইয়ের কাজ হাতে নেন। এভাবে কাজ করে নির্ধারিত সময় সূচীর আগেই সম্পূর্ণ জিচীঘর দান দেওয়ার জন্ত প্রস্তুত হয়ে যায়।

১৯৭৫ ইংরেজী থেকে শ্রদ্ধের বনভাস্ত্রে রাজ্যমাটির উপকণ্ঠে রাজ বনবিহারে অবস্থান করছেন। প্রতি বছর এখানে কঠিন চীঘর দানোৎসব উপলক্ষে দূর দূরান্ত থেকে বহু পুণ্যাধী বৌদ্ধ মন নারীর সমাগম ঘটে। রাজবন বিহারে তখন একটা মেলায় মতই ভিড় জমে উঠে। এই সময় এই অঞ্চলের ভিক্স সংঘ ব্যতীত সমস্তলের বিশিষ্ট ভিক্সদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। তাছাড়া দেশী বিদেশী বহু পর্যবেক্ষক চাকমাদের এই মহাদান যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করার জন্ত এই সময় রাজ্যমাটি রাজবন বিহারে পদার্পন করে থাকেন।

বিবাহ

চাকমা ভাষায় বিয়েকে বলে 'মেলা'। উপযুক্ত বয়সেই চাকমা ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাকে। বাল্য বিবাহ সমাজে অচল। পাত্রীর বয়স কমপক্ষে ১৫/১৬ আর ছেলের বয়স বিশ বছরের কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক। এমনি বয়সে প্রায় ছেলে মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। শিক্ষিতদের মধ্যে বিয়ের বয়স অবশ্য শিক্ষা সমাপ্তির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সমাজে কারো ছেলে বিয়ের যুগিয়া হয়ে উঠলে পাল্টি ঘা দেখে ছেলের বাপ উপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে সে বাড়ীতে কনে দেখতে যায়। দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে মদ অপরিহার্য। তা' আবার যত কড়া হতে পারে তত উত্তম। পান্‌সে মদ নিলে সাধারণের বিশ্বাস মতে, সমস্ত ব্যাপারটাই নাকি পান্‌সে হয়ে যায়। চাকমা সমাজে মদটা এক ধরনের সম্মানের প্রতীক। এমনিতে কেউ কারো কাছে এক বোতল মদ নিয়ে তার দ্বারস্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সেটা রাস্তাসিক সম্মান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কারো কাছে কোন অপরাধে ক্ষমা চাইতে হলেও এক বোতল কড়া মদ নিয়েই ক্ষমা চাওয়া বিধি। অস্ত্রাস্ত্র উপকরণের মধ্যে থাকে জোড়ায় জোড়ায় নারিকেল, প্রচুর পান সুপারী আর হরেক রকমের তেলেভাজা এবং ভাপে সিদ্ধ চাকমা পিঠে। পিঠের মধ্যে 'বিনিপিঠা' অর্থাৎ বিনিধান থেকে প্রস্তুত পিঠে থাকে চাই। যেহেতু উহা ঝাঠাল, তাই সম্বন্ধ ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে বলে সাধারণের বিশ্বাস। পুরোপুরি সম্বন্ধ ঠিক করতে হলে একাধিকবার কনে দেখতে যেতে হয়। প্রায় ক্ষেত্রে তিনবারই পাকা কথা হয়ে যায়, তাই শেষবার কনে দেখতে যাওয়ারকে চাকমা ভাষায় 'তিনপুর' বলে।

চাকমা সমাজে কন্যাপণ প্রথা বিজ্ঞানমূলক। বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে এর কোন অস্তিত্ব না থাকলেও গ্রামের সাধারণ আবেষ্টনীর মধ্যে আজো বিয়ে করতে হলে কনের অন্ত বরকে নির্দ্ধারিত পণ আদায় করতে হয়। চাকমা

ভাষার কল্পাপণকে বলে 'দাভা'। দাভা ছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পাপণের দাবীমতে নগদ টাকা, চাউল, শূকর ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে কনের বাপকে সহায়তা দিতে হয়। এগুলোকে এক কথায় বলা হয় 'উবোর-খজ্জি'। বিয়ের সময় কনেকে যে সব বস্ত্রালঙ্কার দেওয়া হয় সেগুলোকে বলে 'বোয়ালী'। 'তিনপুরের' দিন কনের বাপের বাড়ীতে ছোটখাট একটা ভোজসভা বসে। এ সময় বরকর্তা কন্ডাকর্তাকে প্রচুর মদ এবং বিবিধ উপঢৌকন দিয়ে তার কাছ থেকে পাকা কথ' নিয়ে নেয়। এ অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'মদ পিলাং' গছানো। চাকমা ভাষায় হাঁড়ি পাতিলকে বলে 'পিলা'। এ অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাঁড়ি মদ লাগে। একারণেই বেধ হয় এ অনুষ্ঠানের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এর পরপরই কল্পাপণের দাবী দাওয়া অর্থাৎ দাভা, উবোর-খজ্জি, বোয়ালী ইত্যাদির পরিমাণ ঠিক করা হয়ে থাকে। একে বলা হয় 'ধরা বানাহ'। এই বৈঠকে একেবারে বিয়ের দিন তারিখও ঠিক করা হয়ে থাকে। গণের টাকা আর 'উবোর-খজ্জি বাবদ' কিছু দাবী দাওয়া থাকলে সে সব বিয়ের কিছুদিন আগেই আদায় করে দিতে হয়।

চাকমা সমাজে ঘর জামাই হওয়ারও রেওয়াজ আছে, তবে খুব কম। সেসবের বেলাতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘর জামাই থাকা একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের হয়ে থাকে। মেয়াদ অস্তে জামাইয়ের বৌ নিয়ে পৃথক্যে যাওয়া স্বাধীনতা থাকে। শ্বশুরের কোন পুত্র সন্তান না থাকলে তখন অবশ্য ভিন্ন কথা।

গতানুগতিক প্রথা ছাড়া চাকমা সমাজে আরেক প্রকার সুপ্রাচীন বিবাহরীতি প্রচলিত আছে যার নাম 'ধাবামানা' বা ইলোপমেন্ট। যুগ-যুবতী মনোমিলন হয়ে অনেক সময় বিবাহিত হওয়ার ইচ্ছায় একত্রে জঙ্গলে কিংবা কোন আশ্রয়ের বাড়ীতে আত্মগোপন করে। এ সময় স্বভাব ই তাদের আশ্রয় বৃক্ষন কিংবা সঙ্গী সাথীদের কেউ না কেউ তাদের সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়ে থাকে। সে প্রতিদিন সবার অলঙ্ঘ্য বহির্জগতের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সঙ্গোপনে গুলু ঘাঁটিতে গিয়ে তাদের খবরাখবর দিয়ে আসে

এবং বিপদে আপদে রক্ষাকারী ভূমিকা পালন করে। উদ্ভেদনা স্তিমিত হয়ে এলে এবং বাপ মায়ের মনোভাব অপেক্ষাকৃত অনুকূল মনে হলে এক সময় পলাতক ও পলাতকা তাদের গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন মেয়েটির মা বাপের কাছে একটা কয়সালার জুতা লোক যায়। কোন রকম বাধা কিংবা সম্বন্ধে না আটকালে মেয়েটির মা বাপের দাবী খেনে নিরে এবং সমাজের দাবী মিটিয়ে দিয়ে তখন পলাতক যুগলের বিয়ে হতে পারে। মেয়ের মা বাপের অমত থাকলে কিন্তু গণ্ডগোল লেগে যায়। তখন কিছুতেই আর তাদের বিয়ে হতে পারেনা। সামাজিক বিধান মতে মেয়েটিকে তখন তার মা বাপের কাছে ফেরত দিতে হয়। এভাবে মেয়ের বাপ তিনবার পর্যন্ত মেয়ে ফেরত পাওয়ার অধিকারী থাকে। ছেলেটি চার বারের ঝগড় মেয়েটিকে ফুসলে আনতে পারলে তখন আর কারো মতামতের ভোয়াকা না করে তাদের বিয়ে হতে পারে।

বিয়ের জুতা নির্ধারিত দিনে বরযাত্রী দল বৌ আনতে যায়। চাকমা বর কিন্তু ঘরেই থাকে কেননা আসল বিয়ের অনুষ্ঠানটা বরের বাড়ীতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। বর যাত্রীদলে মধ্যে কয়েকজন বিশেষ পুরুষ এবং নারীর বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। যেমন,—

(১) শ্যালিকা : পাইওনীয়ার রূপে আগে আগে গিয়ে কনের বাড়ীতে বরযাত্রীদলের আগমন, তাদের সংখ্যা ইত্যাদির খবর নিয়ে যায়।

(২) শাওলা : এর দায়িত্ব, কনের বাড়ীতে গুরুজন স্থানীয়দের নিকট সঙ্গে আনীত মদ পরিবেশন, সেই সঙ্গে কনের জন্যে আনা বৌয়ালী অর্থাৎ বস্ত্রালকার ইত্যাদি দেখানো। বৌ সাজানোর পালাতেও তার দায়িত্ব থাকে। সেজন্যে এই লোক প্রায়ই কনের দেবর। নন্দাই ইত্যাদি রহস্য সম্পর্কিত লোক হয়ে থাকে। এর ভূমিকা অনেকটা হিন্দুদের 'মিতবর'এর মত।

(৩) ফুর্বারেং বুগোনী : ফুর্বারেং বা ফুলবারেং বাঁশ কিংবা বেতের কারুকার্য করা ঝাঁপি বিশেষ। উচ্চতায় ২/৩ ফুট, নীচে চার কোণায় চারটি অঙ্গুল বেতের পাল্লা থাকে। উপরের ডালাটি মন্দিরের চূড়ার আকারে বানানো হয়। এই ফুরব ধ্বং এখন আর প্রায় দেখা যায়না। একজা।

সুন্দরী সুশ্রী কুমারী মেয়ে ফুরবেয়াটি পিঠে ঝুলিয়ে নেয়। এর মধ্যে থাকে যাবতীয় বোয়ালী। সাধারণতঃ বরের কনিষ্ঠ সহোদরা কিংবা বরের অপেক্ষা বয়সে ছোট কোন আত্মীয় কন্যাকে এ কাজের জন্য বাছাই করা হয়ে থাকে। অবশ্য এ কাজের জন্য তার কিছু প্রাপ্তিযোগ্যও বিধান আছে। আজকাল ফুরবেয়া এর চল উঠে গেছে। এখন শাবালাই প্রায় ক্ষেত্রে স্টুটকেস এ ভরে বোয়ালীগুলো নিয়ে যায়।

(৪) বো ধরনী :—একজন সধবা প্রাচীনা। যাঁর প্রধান দায়িত্ব হলো নতুন বৌকে সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণে পথ দেখিয়ে ঘরে এনে তোলা।

(৫) বরের পিতৃস্থানীয় একজন বয়স্ক লোক, যাঁর উপর বরযাত্রী দল পরিচালনার ভার থাকে। বিয়ে বাড়ীতে সে মুখপাত্র হয়ে কথা বলে আর কোন গোলযোগ দেখা দিলে বরকর্তার দায়িত্ব নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করে।

স্থানে স্থানে আড়াআড়ি বাঁশ ফেলে বরযাত্রীদের পথরোধ করার প্রথা গ্রামাঞ্চলে এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। এই প্রথা আর লুপ্ত হতে বসেছে। আগেকার দিনে আর কোথাও না হোক কনের পাড়ার সীমানার পৌছতেই পাড়ার যুবকেরা ‘যুদ্ধং দেহি’ ভাব নিয়ে একবার বরযাত্রীদের পথ আটকাবেই। এটা বোধ হয় সুপ্রাচীন কালেরই একটা লুপ্তাবশেষ প্রথ-শক্তি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে কন্যা অর্জনই যার লক্ষ্য। এখন অবশ্য দণ্ড দিতে হয় সামান্যই; এক বোতল মদ কিংবা পাঁচ দশ টাকা ফেলে দিলে অবাধ গমনের অধিকার মিলে দস্তুর মাকিক করসোলা না করে বাঁশ ভিন্গোতে গেলে কিন্তু বিষম বিপদ। এরূপ ক্ষেত্রে এখনও সত্যি সত্যি একটা গণ্ডগোল বেঁধে যেতে পারে। তবে অবশ্য সেরকম কেউ করেনা। সাধারণের বিশ্বাস, এসব প্রতিরোধ বৈধভাবে দূর করা না হলে বর কনের ভবিষ্যত জীবনে নানাবিধ অমঙ্গল দেখা দিতে পারে।

চাকমা বিয়ের অনুষ্ঠানকে বলে 'চুমুনাং'। এ বিষয়ে পুস্তকের প্রথম ভাগে 'চুমুনাং' অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। তবে চাকমা বিয়েতে আরেক অনুষ্ঠান রয়েছে। যার নাম 'জদন্ বানাহ'। অনুষ্ঠানটি এক প্রকার স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং এতেই বর কনের বিয়ে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। এতে কোন মন্তোচ্চারণের বালাই নেই। চুমুনাং অনুষ্ঠানের পরে অঝা কিংবা শাখাল। অথবা বর কনের ঠাট্টা স্মৃতিদের যে কোন লোক সাধারণতঃ বর কনের ভাবী বসবাসের জন্ত নির্দিষ্ট কাক একখানা পাটির উপরে বরের বামে কনেকে বসিয়ে উচ্চৈশ্বরে বিয়েতে উপস্থিত জন মণ্ডলীর মতামত প্রার্থনা করে, - 'জদন্ বানি দিবার্ উখুম্ আষে নে নেই ?' অর্থাৎ বর কনের জোড়া বাঁধার ছকুম আছে কিনা। সকলে তেমনি উচ্চৈশ্বরে 'আছে, আছে,- বলে স্বীকৃতি জানালে উক্ত লোক তখন সঙ্গে সঙ্গে একখানা সাতহাত লম্বা বস্ত্র খণ্ড নিয়ে উপবিষ্ট বর আর কনের কোমরে একত্রে বাঁধে সমাজে কোথাও যাতে গোপনে অবৈধ বিবাহ সম্পন্ন হতে না পারে তজ্জন্ত এই বিধি বিধান চালু হওয়ার অন্ততম মুখ্য উদ্দেশ্য বলে আমার মনে হয়। এরপর বরের বামহাত কনের পৃষ্ঠে বসিয়ে তার বাম কাঁধে অনুরূপভাবে কনের ডান হাত বরের ডান কাঁধে বসিয়ে দিয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ করে দেওয়া হয়। ঐ স্থানে সাধারণতঃ বর কনের ঠাকুর্দা ঠাকুরমা ইত্যাদি বুড়ো বুড়িরাই উপস্থিত থাকে, বাপারটা যাতে তাদের পক্ষে কম লজ্জাজনক আর সহজ হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় কিছু ডিম মাখা ভাত বরের বাম হাতে ও কনের ডান হাতে তুলে দিয়ে পরস্পরকে খাইয়ে দিতে বলা হয়। এভাবে তাদের পানও খাওয়ানো হয়ে থাকে। তারপর আবার সমাজের অনুমতি নিয়ে যখন তাদের বাঁধন খুল দেওয়া হয়ে থাকে তখন বর আর কনে তড়িৎ গতিতে আসন থেকে উঠে পড়ে। সাধারণের বিশ্বাস যে এই আসন থেকে আগে উঠতে পারে, সে-ই সারাজীবন অপরজনের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারবে।

চাকমা বিয়েতে যেন তেন প্রকারের একটা সামাজিক খানা দেওয়া

একরূপ বাধাতামূলক। অন্ততঃ পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে এই খানা চুকিয়ে দিতে হয়। এর নাম চাকমা ভাষায় ‘খানা সিরানা’। এর ব্যত্যয় ঘটলে সামাজিক দণ্ডের বিধান আছে। বিয়ের খানার ‘টক’ একটা অপরিহার্য বাজান, চাকমা ভাষায় যাকে ‘খাদা’ বলা হয়ে থাকে। খাদা খাওয়া না হলে ‘খানা সিরানা’ ব্যাপারটাই একরূপ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিয়ের অব্যবহিত পরেই নবদম্পতিকে কনের বাপের বাড়ীতে জোড়ে যেতে হয়। অন্ততঃ কনের বাপের বাড়ীতেই স্বামী জ্বর প্রথম নিশি যাপন বিধি। একে বলে ‘ব্যান্দুদ্ভাঙা’। ব্যান্দুদ্ভাঙার পূর্বে নতুন বৌ আর নতুন জামাইয়ের ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত কারো বাড়ীতে উঠা নিষেধ। অনিবার্য কারণে অচিরকাল মধ্যে ব্যান্দুদ্ভাঙা যাওয়া সম্ভব না হলে নিকটস্থ কনের গোষ্ঠীভুক্ত কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে যাওয়া বিধেয়। তদভাবে পত্রবহুল কোন সবুজ গাছের নীচে গিয়ে চড়ুইভাতির মত একবেলা পানাহার করে এলেই চলে।

মৃত সংকার

চাকমা সমাজে কারো মৃত্যু হ’লে মৃতদেহ দাহ করা হয়ে থাকে। তবে একেবারে কচি শিশু কিংবা কোন সংক্রামক রোগে মৃত ব্যক্তির দেহ না পুড়িয়ে কবর দেওয়ার বিধান আছে। শিশুর কবরকে চাকমা কথায় ‘পুরা কবা’ বলে আর বয়স্ক লোকের কবরকে বলা হয় ‘গোর’। সাধারণতঃ দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামলে ঘর থেকে মড়া বের করে শ্মশানে নেওয়া হয়। তার আগে মড়া বার করা যায় না। চাকমাদের মধ্যে বিস্তৃত বৃথাবয়ে মৃত সংকার হয়না। কোথাও যেতে হলেও চাকমাদের পক্ষে ঐদিন একদম যাত্রানাস্তি। মৃত্যুর সাথে সাথে অর্থাৎ একই দিনে মৃত সংকার করাও সম্ভব হয়না, কারণ এ কাজে প্রস্তুতি লাগে এবং মৃতের আত্মীয়বর্গের জড় হতেও সময়ের দরকার হয়। সাধারণতঃ মৃত্যুর পরবর্তী দিনেই দাহক্রিয়া

সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। আগেকার দিনে শব্দাহ থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত মৃতের যাবতীয় শেষকৃত্য কুরিদের পৌরহিত্যেই সমাধা করা হত। এখন এসমস্ত অমুষ্ঠানাদিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু আমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

কোন বাড়ীতে কারো মৃত্যু হলে তার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত ঐ বাড়ীতে অশোচ চলে। সাধারণতঃ সপ্তাহকাল পরে মৃতের শ্রাদ্ধ দেওয়া হয়। এক্ষণে চাকমা সমাজে শ্রাদ্ধকে সাদিন্দ্ৰা বা সাপ্তাহিক ক্রিয়া বলে। বৎসরান্তে মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। চাকমারা মৃত্যুবার্ষিকীকে বলে বোজোরি'। অবস্থাপন্ন ঘরে উপযু্যপরি তিন বৎসর কাল পর্যন্ত মৃতের বোজোরি দেওয়া হয়ে থাকে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ছুঁয়ারে ছুঁয়ারে মাটির মাল্‌সাতে আগুন রাখা হয়। বোধ হয় কোন অপদেবতার অমুপ্রবেশ নিবারণের উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়ে থাকে। মৃত সংকার পর্যন্ত এগুলি স্থলতে থাকে এবং সে পর্যন্ত বাড়ীতে অরত্নন ব্রত পালিত হয়। অতঃপর সাপ্তাহিক ক্রিয়া পর্যন্ত বাড়ীস্থ সকলে এবং অপরাপর আত্মীয়বর্গ নিরাস্রিয় খাও গ্রহণ করে। মৃত সংকারের জন্ত নিয়োক্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে থাকে।

মৃতকে গোসল করানোর অন্তে প্রথমে যেমন তেমন একটা খাটিয়া তৈয়ার করা হয়। গোসল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়। মৃত বহনের জন্যও আলাদা একটা খাটিয়া তৈয়ার করা হয়ে থাকে। এটাকে বলা হয় 'আলং'। বাঁশ কাঠ দিয়ে এটাকে একটু মজবুত করে বানাতে হয়। শ্রাশানকে চাকমা ভাষায় 'চবাশাল' বলে আর চিতাকে বলা হয় 'কুঠাকু' 'কুঠাঘর'। চিতা সাজানোরও বিশেষ পদ্ধতি আছে। চিতার দৈর্ঘ্য বিবেচনা করে প্রথমে তিন সারি কাঁচা কাঠের খুঁটি পুঁতে নিতে হয়। এগুলোকে বলে 'খুংগাছ'। এগুলোর ফাঁকে ফাঁকে এক প্রস্থ কাঠ দিয়ে খুঁটিগুলোতে জোড়ায় জোড়ায় বাঁধতে হয়। এটাকে বলে এক পল্লা অর্থাৎ এক পরত। এমনভাবে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে পাঁচ পল্লা এবং স্ত্রীলোক হলে সাত পল্লা কাঠ চিতায় ঢাপাতে হয়। কাঠের

উচ্চতা যত বাড়ে চিতার উপরের দিকটাও তত প্রশস্ত হয়ে পড়ে। এরপর চিতার ধারে পাশে ইচ্ছেমত কাঠ চাপানো চলে। চিতার উপরে আবার 'চাম্রোয়া কানি' অর্থাৎ চাঁদোয়া খাটাতে হয়। এর জন্ত চারটি এমন লম্বা বাঁশ লাগে যাতে চিতার আগুনের শিখা চাঁদোয়াটাকে স্পর্শ করতে না পারে। চিতায় আরেকটি জিনিষ বানাতে হয়, যার নাম 'রাধাঘর'। রাধাঘর আজকাল অনেক করেনা, তবে গাভীটানা উৎসবের জন্য এটি অপরিহার্য। পরবর্তী অধ্যায়ে এর নির্মাণ পদ্ধতি দেওয়া গেল।

মৃত সৎকারের আগের দিন রাত্রে মৃতের জন্য নতুন হাঁড়িতে ভাত হাঙ্গা করে নতুন সরিষা চাপা দিয়ে উল্লুনের উপরে রেখে দিতে হয়। এগুলোকে বলে 'কানজাধা ভাত'। সাধাধারণের বিশ্বাস মৃত আত্মা এই ভাত খেতে আসে। অনেক সময় নাকি ঢাকা দেওয়া ভাতের উপর কিংবা উল্লুনের আশে পাশে তার চিহ্ন পাওয়া যায়। পরদিন হাঁড়ির ভাত কল'পাতায় মুড়ে মৃতের জন্যে চারটি ভাতের মোচা বেঁধে দেওয়া হয়। সকালে মৃত ব্যক্তিকে জ্ঞানের খাটিয়াতে তুলে বাইরে এনে স্নান করানো হয়ে থাকে। তারপর নতুন জামা কাপড় পরিয়ে মাথায় খবং জড়িয়ে 'সিংকাবা' অর্থাৎ বহির্বাটিতে এনে আলং এর উপর শোয়ানো হয়। অ'লং এর উপর মৃতের জন্য বিছানা পাতারও বিধি বিধান আছে। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে নতুন পাটির উপর পাঁচ পরত এবং স্ত্রীলোক হলে সাত পরত নতুন কাপড় দিয়ে বিছানা পাততে হয়। মৃতের আপাদমস্তক নতুন চাদরে ঢাকা দেওয়া থাকে। এই সময় মৃতদেহের উপরে এবং আশে পাশে হরেক ফুলও দেওয়া হয়ে থাকে। এরপর থেকে শ্মশানে না নেওয়া পর্যন্ত মৃতের আত্মীয় অনাত্মীয় সারাই মৃত সৎকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসে, প্রত্যেক মৃতের বৃকের উপর কিছু না কিছু অর্থদান দিয়ে থাকে। এগুলোকে বলে 'বুগোকড়ি' অর্থাৎ বৃকের কুড়ি। এ সবে উপর গৃহস্থের কোন দাবী থাকেনা। এ বাবদ প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থকড়ি মৃত সৎকার এবং মৃতের সাদিন্যা অর্থাৎ সাপ্তাহিক ক্রিয়া অনু-

ষ্ঠানের জন্য দান সামগ্রী সংগ্রহে ব্যয়িত হয়। মৃতের কাপড়ে খুঁটে লিঙ্ক আধুলি যা'হোক একটা পয়সা বেঁধে দেওয়া হয় যা' তার পারের কড়ি মনে করা হয়ে থাকে। হিন্দু বিশ্বাস মতে মৃত্যুর পরে স্বর্গ গমনের পথে বৈতরণী নদী পার হতে হয়। এখানে তারই সুপ্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শ্মশানে নেওয়ার প্রাকালে মৃতদেহ বাহির প্রাঙ্গনে এনে রাখা হয়। এখানে মৃতকে সামনে রেখে সমবেত ভাবে সকলে বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরগসহ পঞ্চলীল দিয়ে বুদ্ধ মন্ত্র শ্রবণ করে। এর পর মৃতকে খাওয়ানো এবং মরায়্ জেদয়্ ফারক্ ইত্যাদি অনুষ্ঠান। শেষোক্ত ব্যাপারে প্রথমে মৃতের খাটির সঙ্গে সাতগাছি সুতো বেঁধে অপর প্রান্ত মৃতের পরিবারস্থ সকলে ধরে থাকে। অনেকে এ সময় সুতোয় একটা মুরগীও বেঁধে দেয়। তারপর উপস্থিত সকলের কাছে উচ্চৈষরে তাদের মতামত চাওয়া হয়ে থাকে, 'মরায়্ জেদায়্ ফারক্ গুরি দিবার উষুম আঘে নে নেই? অর্থাৎ মৃত আর জীবিতদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ছকুম আছে কিনা। সবাই তেমনি উচ্চৈষরে 'আছে, আছে' বলে সম্মতি দিলে সুতোটা তখন মাঝখানে এককোণে কেটে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পরেই শবযাত্রা করতে হয়। কারণ, এর পরে আর মৃতদেহ ঘরে রাখা চলেনা। শ্মশান যাত্রার পথে পথে ঐ ছিটানোর নিয়ম, তবে বর্তমান অর্থ সঙ্কটের দিনে এটা আর সম্ভব হয়ে উঠেনা। এখন শুধু শ্মশানে শব নিয়ে চিতা প্রদক্ষিণের সময় মাত্র কিছুটা ঐ ছিটানো হয়ে থাকে। শ্মশানে প্রথমে খাটিয়া শুদ্ধ শবদেহ রাধাঘরের উপর তুলে চিতা প্রদক্ষিণ করতে হয়। পুরুষ হলে পাঁচবার এবং স্ত্রীলোক হলে সাতবার। প্রতিবার প্রদক্ষিণের পর চিতার সঙ্গে রাধাঘর ঠেকানো হয়ে থাকে। একে বলে 'চিতা সালামী'। প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তখন রাধাঘর থেকে শবদেহ নামিয়ে খাটিয়া সহ চিতায় তুলে দেওয়া হয়। এই সময় শেষবারের মত মৃতকে আরেকবার খাওয়ানো হয়ে থাকে। এর পরেই চিতার আগুন দেওয়া হয়। প্রথমে মৃতের বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ লোকই চিতায় আগুন দেওয়ার নিয়ম। হিন্দুরা

একে বলেন মুখাগ্নি করা আর চাকমা প্রথা মতে এটা 'আহুদ্য আশুন
দেনা।' অর্থাৎ হাতের আশুন দেওয়া।

পরদিন ভোরে হাড় ভাসান অনুষ্ঠান। প্রথমে চিতার জল ঢেলে
চিতার আশুন নিভিয়ে একটা নতুন হাঁড়িতে মৃতের অস্থি-সংগ্রহ করে রেখে
অবশিষ্ট কয়লা এবং ছাই জলে বিসর্জন করা হয়ে থাকে। এজন্য চাকমাদের
শ্মশান মাড়েই জলের ধারে করা হয়। এরপর চিতা লেগে মাঝখানে জাক'রি
বেড়া দিয়ে চতুষ্কোণ আকারে একখানা ঘেরা দিতে হয়। তার একধাংগে এক-
খানা খোলা দরজা থাকে। অনেকে এই ঘেরাটার উপর যেমন তেমন একখানা
চালা করে দেয়। ঘেরার ভেতরটায় কলাপাতা পেড়ে মৃতের অন্ত অনেক কিছুই
রেখে আসা হয় যেমন, মেমা মিচ্চিরি অর্থাৎ চিনি মিছরি ইত্যাদি মিষ্টিসহ
হরেক রকমের পিঠা, জলভরা একটি নতুন কলসী এবং একটি নতুন কপ্তি,*
তামাকসহ ছ'কো কলকে, আয়না, চিক্রণী, পুরানো দা কাঁচি ইত্যাদি।
তাছাড়া চারধারে হরেক রকমের শাক সবজির বীজ ছিটানো হয়ে থাকে।
সাধারণের বিশ্বাস এভাবে শ্মশানে দিয়ে আসা চিক্রণী দিয়ে মাথা আঁচড়ালে
মরামাস দূর হয়।

এরপর আসল হাড় ভাসান অনুষ্ঠান। মৃতব্যক্তির ছেলে যারা চিতা
পরিষ্কার করতে আসে তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সাতগাছি স্তুতার
একশ্রান্ত ধরে তীরে দাঁড়িয়ে থাকে আর অপর একজন বয়ঃকনিষ্ঠ লোক
অপরপ্রান্তে তার বাঁ হাতের কড়ে আগুলে জড়িয়ে নিয়ে সংগৃহীত অস্থিসহ
হাঁড়িটি নিয়ে জলে নামে। সে ব্যক্তি ভীরুমুখী হয়ে জলে দাঁড়িয়ে এক,
দুই, তিন করে ছয়বার হাঁড়িটি জলে চুবিয়ে তোলে আর সপ্তমবারে নিজের
সঙ্গে সঙ্গে একডুব দিয়ে উঠেই হাঁড়িটা মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে পেছনে
গভীর জলে ছুঁড়ে মারে। এসময় তার পেছনে কিরে দেখতে নেই।

* একপ্রকার মাটির তৈরী জলপাত্র, দেখতে অনেকটা গাড়ুর মত। গলাটা
সরু এবং ঈষৎ লম্বা।

অতঃপর তীরে দাঁড়ানো লোকটিকে হাতের মৃত্তা টেনে তাকে ডাঙ্গায় উঠিয়ে নেয়। মৃতদাম্ অর্থাৎ সামাজিক বিধিমাতে মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পুত্রকেই এভাবে হাড় ভাসাতে হয়। চাকমা সমাজে বাপের কিংবা মায়ের মৃত্যুতে ছেলেদের মাথা মুড়ানো মিয়ম। একাক্ষত্বে হাড় ভাসানোর দিন শ্মশানে কিংবা বাড়ীতে বসেও সমাধা করা যায়। সাধারণতঃ যার যে বাড়ীতে মৃত্যু হয় সে বাড়ীতেই তার শ্রাদ্ধ দেওয়া হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান না থাকলে ভ্রাতৃপুত্রদের মধ্যে কাউকে এসে তখন মৃত সংকার, হাড় ভাসান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কাজের ভার নিতে হয়।

চাকমা সমাজ লারমা, খাবেং, কুংকুত্যা, ষড়ুয়া, ওয়াংবা ইত্যাদি ছত্রিশ গব্বা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মৃত সংকার বিষয়ে এয়াং বা' যা' বলা হয়েছে গব্বা ভেদে সেগুলি সম্প্রদানে কিছু কিছু হের ফের হয়ে থাকে। তবে সংকার পদ্ধতি মোটামুটি একই। হাড় ভাসানোর দিন সংকার কাজে আমন্ত্রিত ভিক্ষুকে ভোজন করানো হয়ে থাকে। মগ ভাষায় একে বলে 'হ্লাগ্নোই সুয়েং'। এইদিন থেকে মৃতের বাড়ীতে রান্নাবান্না করা চলে। সাপ্তাহান্তে মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধ দেওয়া হয়। তবে এই সাতদিন গণনার মধ্যেও কিছুটা হের ফের হয়ে থাকে। অনেকে মৃত্যু দিবস থেকে, কেউ কেউ দাহক্রিয়ার দিন থেকে আবার কেউ কেউ হাড় ভাসানোর দিন থেকেও এই সাতদিন গণনা করে থাকে।

শ্রাদ্ধের দিন ভিক্ষু ভোজনসহ প্রচুর লোকজন থাকিয়ানো হয়। এই সময় মৃতের উদ্দেশ্যে আদারাহ্ অর্থাৎ পিতৃদান এবং মৃত আত্মার সদগতি কামনায় উপস্থিত ভিক্ষু সংঘকে বিবিধ দান দেওয়া হয়ে থাকে। সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরে ভিক্ষু ব্যবহার্য্য অষ্ট পরিকার দান ছাড়া অনেকে গরু, সোনা, রূপা ইত্যাদিও দান করেন। শ্রাদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যা সমাগমে শ্রাদ্ধকারী চিত্তায় বিধিমাতে প্রদীপ জালিয়ে মৃত আত্মাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসে। মৃত সংকার কাজে যাঁরা অংশ নিতে আসেন শ্রাদ্ধের সময় তাঁদের সকলকে

নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গ এবং মৃতের আত্মীয়স্বজন প্রত্যেকে মৃতের উদ্দেশ্যে দান দেওয়ার জন্য কিছু না কিছু দানীয় সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই সমস্ত বিকশি সামগ্রী এবং মৃতের বুগোকড়ি ও গৃহস্থের নিজস্ব অর্থানুকূল্যে সংগৃহীত যাবতীয় দান সামগ্রী সম্মিলিতভাবে মৃত আত্মার উদ্ধগতি কামনার দক্ষিণাসহ জল ঢেলে ভিক্ষু সংঘকে দান দেওয়া হয়ে থাকে। অনেকে আত্মের সময় মৃতের চিতায়ও ভাতজ্বার মত মৃতের জন্য পুখক আদারাহ্ নিবেদন করে আসে। চিতায় সারি সারি তাংগোন্ অর্থাৎ কাপড়ের ধজা পতাকা ওড়ানো হয়। মৃত্র পিটকে ধজগ্গ পরিভা: নামে একটি পরিজ্ঞাণ মৃত্র আছে, তারই অনুসরণে চাকমাদের মৃতের চিতায় এই কাপড়ের ধজা ওড়ানো হয়ে থাকে।

আগেকার দিনে চাকমা সমাজে আত্মের নিমন্ত্রণে প্রচুর দৈ খাওয়ানো হত। বিবাহ ভোজে যেমন 'খাদা' অর্থাৎ টক, আত্মের সময় তেমন দৈ ছিল অপরিহার্য। তখন আত্ম মানেই ছিল দৈ খাওয়া। কারো মৃত্রা সংবাদ পাওয়া মাত্র তখনকার দিনে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যারাই গবাদি পশুর মালিক তারাই পরদিন থেকে মাটির কলসীতে দৈ বসানো শুরু করতেন এবং সপ্তাহকালের মধ্যে যা' দৈ জমতো সে সবই বিনা মূল্যে মৃত্র আত্মীরের 'সাদিগ্রায়' দিয়ে আসতেন। এখন আর দৈ কোথায়? সে সব দিনের কথা এখন স্বপ্ন।

গাড়ী টানা

চাকমা সমাজে কোন ঐতিপত্তিশালী লোকের মৃত্রা হলে তাঁর মরদেহ নিয়ে রথটানা উৎসব চলে। চাকমারা এ উৎসবকে বলে 'গাড়ীটানা'। মৃত্রা অবশ্য সবসময়ই শোকাবহ; কিন্তু কোথাও কারো মৃত্রাতে তাকে নিয়ে

গাড়ীটানা হবে ঠিক করা হলে তখন গোটা অঞ্চলে সাড়া পড়ে যায়। শোকোৎসব তখন একটা মহোৎসবের রূপ নেয়। গাড়ীটানা উৎসবের প্রস্তুতিও তেমনি বেশ ব্যাপক। এতে বেশ কয়েক পাড়ার লোকের সক্রিয় সহযোগিতা দরকার হয়ে পড়ে। যেই যেই পাড়ার লোকের উপর যেই বিশেষ বিশেষ কাজের ভার হস্ত হয় সেই সেই পাড়ার লোকও বিনা বিধার স্বৈচ্ছাশ্রম দিয়ে সে কাজটা সমাধা করে দিয়ে থাকে। সবাই মনে করে এ সমস্ত কাজে শরিক হলে বিপুল ধুগোর ভাগী হওয়া যায়। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, চাকমা সমাজে মৃত সৎকার কাজে কেউ কাউকে বলার অপেক্ষা রাখেনা, স্বভঃ প্রবৃত্ত হয়ে সবাই এসে একাঙ্গে অংশ গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া প্রতি পাড়াতে কিছু কিছু লোক থাকে, যারা এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা রাখে। গাড়ীটানার প্রস্তুতি পর্ব সম্পূর্ণ হতে ২।৩ দিন লেগে যায়। ততদিন শবদেহটাকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত রাখা যায় সেজন্তে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। গাড়ীটানা উৎসবের জন্ত নিম্নোক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন।

১। গাড়ীঘর বা রথ নির্মাণ

২। গাড়ী ঘিলা বা রথের চাকা তৈয়ারী

৩। গাড়ী কাঝি বা মোটা মোটা বেতের রশি পাকানো এবং

৪। রাখাঘর নির্মাণ।

গাড়ীঘর :

গাড়ীর পাটাতনের মত একটা মজবুত কাঠামোই হচ্ছে গাড়ীঘর। একটা রাখাঘর এটার উপর স্বচ্ছন্দে বসানো যেতে পারে একরূপ পরিমাপে এটা বানানো হয়ে থাকে। মজবুত বেণ কিছু কাঠদণ্ড লম্বালম্বি সারি করে প্রান্তে অল্পরূপ করেকটা কাঠদণ্ডের সাথে শক্তভাবে বাঁধা হয়। এর নীচে অল্পশ্চাৎ দুইদিকে চাকা লাগানোর জন্তে মালাদা বন্দোবস্ত থাকে।

পাটাতনের উপরে সমান মাপের তরজার বেড়া বুনে দেওয়া হয়।

গাড়ীঘিলা :

গাড়ীটানার জন্তে চারটি চাকার দরকার হয়। এগুলি উপযুক্ত গাড়ী ঘরের নীচে লাগানো হয়ে থাকে। তবে দৈব ছবিপাকের মোকাবেলার জন্তে দু'টি চাকা বেশী বানানো হয়। মোটা মোটা গাছ কেটে সাইজ করা টুকরো টুকরো গাছের কাণ্ড থেকে এগুলো খুঁদে বার করা হয়ে থাকে।

গাড়ীকাষি :

গাড়ীটানা কাজে প্রায় ১৫/ ৬ খানা মোটা পাকানো রশি লাগে। কচি বাঁশের বেত দিয়ে এ সমস্ত রশি পাকানো হয়ে থাকে। এগুলো মুর্তিতে ধবে এরূপ মোটা আর এক একটার দৈর্ঘ্য ৬০/৭০ হাতও হতে পারে। প্রাথমিক ভাবে গাড়ীতে সামনে পিছনে তিনটা করে ছয়খানা রশি লাগে। জন সংখ্যার অনুপাতে রশির সংখ্যাও বাড়ানো হয়ে থাকে। তাছাড়া টানাটানির সময় অনেক রশি ছিঁড়ে যায় সেজন্তেও যথেষ্ট সংখ্যক বাড়তি রশির জোগাড় রাখতে হয়। এ কাজটা তাই এক এক পাকার লোকের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়ে উঠেন।

রাধাঘর :

‘রাধাঘর’ মড়া বা শবদেহ রাখার আলাদা একটা বিশেষ ব্যবস্থাপনা। রাধা অর্থ মড়া। চাকমা ভাষায় মগদা, রাধা, পাল্যেং, গিগ্‌গিনি, চম্ব্বেং, চম্ব্বেং ইত্যাদি শব্দ সমার্থবোধক। প্রথমে বাঁশ দিয়ে রাধাঘরের কাঠামোটো তৈয়ার করতে হয়। তারপর বাঁশের চাটাই দিয়ে এর চার পাশটা মুড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। তুলার দিকটা মুখ খোলা থাকে, তবে উপরের মুখে শবদেহ রাখার জন্তে একটা পাটতন করে নিতে হয়। জিনিসটা যদিও চতুর্দোণ হয়ে থাকে, আকারে অনেকটা ডম্বর মত, মার্ব্বখানে খানিকটা চাপা।

এর উপর শবদেহ রেখে গোটা রাধাবরটাই গাড়ীঘরের উপর চাপিয়ে দিয়ে চারধারে গাড়ীর সঙ্গে মজবুত করে বাঁধা হয় যাতে এপাশে ওপাশে কোন দিকে হেলে পড়তে না পারে। পাটাতনের উপরে শবদেহ রাধার জায়গা মজবুত জাকরি বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে। তারপর একটা লম্বা বাঁশ আগার দিকে হাতখানেক অক্ষত রেখে তার নীচের দিকটা লম্বালম্বি সমান চার ফালি করে এক একটা ফালি উপরোক্ত ঘেরার চারকোণের চারটি খুঁটির মাথায় ঢুকিয়ে বসানো হয়। তখন এই জিনিসটা একটা মন্দিরের গম্বুজ কিংবা রথের চুড়ার মত দেখায়। বাঁশের অক্ষত অংশটার মাথায় 'খাদি' দিয়ে বানানো একটা মূর্তির মত জিনিস ঝোলানো হয়ে থাকে। চাকমারা এটাকে বলে 'ক' অর্থাৎ ঘুঘু পাখী। চাকমা বিশ্বাস মতে 'ক' শক্তির প্রতীক। এসব ছাড়াও হরেক রকমের কাণ্ডে ফুল পতাকা দিয়ে রাধাবরটাকে অপরূপ সাজে সাজানো হয়ে থাকে।

সব কিছু তৈরী সম্পূর্ণ হয়ে গেলে নির্দিষ্ট দিনে পড়ন্ত বেলায় গাড়ী-টানা শুরু হয়। তখন গাড়ীটানার মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে, অনেক দোকানপাটও তখন বসে যায়। সারা অঞ্চলের লোকজন তখন এই উৎসবে অংশ নিতে আসে। এই গাড়ীটানা অনেকটা শবদেহ নিয়ে 'টাগ্ অব ওয়ার' খেলার মত। মৃত ব্যক্তির শবদেহ রথের উপরে রেখে দলে বেদলে বিভিন্ন রকমে এই গাড়ীটানা প্রতিযোগিতা চলে। কখনও পাড়ার পাড়ায়, গোঁজে গোঁজে, কখনওবা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে, বিবাহিত অবিবাহিতদের মধ্যে, বুঁক বুঁকীদের মধ্যে টানাটানি প্রতিযোগিতা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতার সময় তুমুল রবে ঢোলবাত্ত বাজে, গোলা ফুটে, আকাশে হাউই ছেঁড়া হয়। প্রতি দলের সমর্থকরা দলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে মুখের মধ্যে তর্জনী আর মধ্যমাঙ্গুলি পুরে একপ্রকার তীক্ষ্ণ সিঁটি বাজিয়ে নিজেদের লোককে উদ্দীপিত করে তোলে। চাকমারা এই প্রকার গিঁটি বাজানোকে 'খ্যাংশিক' বলে। চাকমাদের মৃত সংস্কারের সময়কার ঢাকের বাজনাও প্রতিযোগীদের

মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা আনে। এই বাজনার একটা বিশেষত্ব আছে। একটা মাত্র ঢাকের উপর ছজন লোক কাঠি দিয়ে এক বিচিত্র ভালে এই বাজনা বাজায়। এই ভাল চাকমাদের নিজস্ব। প্রতিযোগিতার সময় গাড়ী টানার মাঠটাকে একটা যুদ্ধক্ষেত্র বলেই ভ্রম হতে পারে। প্রতিযোগীদের মধ্যেও তখন যুদ্ধের মতই একটা প্রচণ্ড উন্মাদনা জাগে। সমানে সমানে টানাটানি হলে অনেক সময় ২।১ টা রশি ছিঁড়ে যায়। তখন নতুন রশি এনে তৎক্ষণাৎ সেখানে সংযোগ দিতে হয়। অনেক সময় সমানটানের চোটে রাধাঘর শুদ্ধ সম্পূর্ণ গাড়ীখানাই কোমর সমান উপরে উঠে যায়। এসময় নেতৃস্থানীয় কিছু লোক গাড়ীর পাশে থেকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে যাতে কোন অঘটন ঘটতে না পারে। এভাবে দিনের বাকী সময় গাড়ী টানাটানি করে সন্ধ্যার সময় শবদেহ নামিয়ে চিত্তান্ত তুলে দেওয়া হয়।

কিংবদন্তী মতে চাকমাদের পূর্ব পুরুষ রাজা সাখংগিরি এই প্রকার রথে চড়ে শশরীরে স্বর্গে গমন করেন। তখন থেকে রথে তারই অনুরণে চাকমা সমাজে রাজা কিংবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হলে এভাবে তাঁকে সম্মানিত করা হয়ে থাকে। রাজ্যমাটিতে শেষ গাড়ীটানা উৎসব চলে ১৯৮০ ইংরেজীতে। স্থানীয় আনন্দ বিহারে অধ্যক্ষ উ জবন তিব্ব মহাস্থবিরের মহাপ্রসাদে তাঁর মরদেহ নিয়ে মহা সমারোহে 'তখন গাড়ীটানা উৎসব উদযাপিত হয়। সম্প্রতি ২২ নং ঘাগড়া মৌজার হেডম্যান বাবু স্নেহ কুমার দেওয়ান মাতা শশী কুমারী দেওয়ানের মৃত্যুতে তাঁর মরদেহ নিয়ে বিগত ১৪।১২।৮৫ ইং তারিখে বিপুল সমারোহে গাড়ীটানা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

পরিশিষ্ট

হাল আমলে চাকমা সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সে কারণে বৌদ্ধ ধর্মভিত্তিক আচার অনুষ্ঠানগুলোই এখন সমাজে প্রাধান্য পাচ্ছে। পূর্বে ভিক্সু সমাজ এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে নিছক নিজেদের প্রচেষ্টায় ধর্মকে কোন রকমে শুধু জীইয়ে রেখেছিলেন। মৃত্যু আর আত্মাদি ব্যাপারেই শুধু তখন এঁদের দেখা যেত। এঁদেরও অধিকাংশ ছিলেন মারমা সম্প্রদায় ভুক্ত। বস্তুতঃ ধর্মকথিক ভিক্সু বলতে এদেশে তখন কেউই ছিলেন না। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে আরাকানের সংঘরাজ মহাপণ্ডিত গুণামেজু মহানুবির এদেশে এসে চট্টগ্রাম আর পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম সংস্কার কাজে ব্রতী হন। তারও অনেক পরে বিগত পঞ্চাশের দশকের শেষপাদে রাজগুরু ত্রীমং অগ্রবংশ মহানুবির ব্রহ্মদেশে শিক্ষা সমাপন করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তখনকার চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় সঙ্গে সঙ্গে তখন তাঁকে রাজগুরু পদে বরণ করে নেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ফলে চাকমা সমাজে তখন ধর্মীয় জাগরণ আসে। ধর্ম সংস্থাপন কাজে তাঁর অবদান বহুব্যাপক। পরবর্তীতে মহাসাধক বনভন্তের আবির্ভাব ঘটলে সেক্ষেত্রে জোয়ার দেখা দেয়। চীবর দান, সংঘ দান, প্রাত্যহিক শীলাচার বিধি ইত্যাদি তখন তাঁর উদ্যোগে সমাজে ভ্রমসী প্রসার লাভ করে। বৈশাখী পূর্ণিমা, বর্ধাবাস, প্রবারণা, কান্তিকী পূর্ণিমা ইত্যাদি প্রতি বৌদ্ধ পর্বদিনে উপোসথ পালনকারীদের সংখ্যা এখন বেশ প্রচুরই বলা চলে। বিগত ১৯৭৫ ইংরেজীতে লেখকও নিজে ভিক্সু বর্ধাব্রতের সময় অঙ্কের বনভন্তের অনুশাসন তলে একাঙ্গনিক ও পঞ্চপিণ্ডিক

পরিশিষ্ট

এ ছ'টি ধৃত্য ব্রতসহ ত্রৈমাসিক প্রতিহার্য উপাসন ব্রত পালন করেন। রাজগুরু শ্রীমৎ অত্রবংশ মহানুবিদ চাকমা সমাজ জীবনে যেন আগে ভাগে এসে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যান আর অন্ধের বনভ্রম্ভে সেই উর্বর ভূমিতে সন্ধর্মের বীজ বপন করেন। সেই বীজ এখন অক্লুপিত হয়ে শত শাখা প্রশাখা পল্লবে সুশোভিত বিরাট মহীকূলে পরিণত হয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে আজ ক্ষুদ্র রাজ্যমাটি রাজবন বিহারের দ্বারে দিগন্ত এসে থরা দিয়েছে।